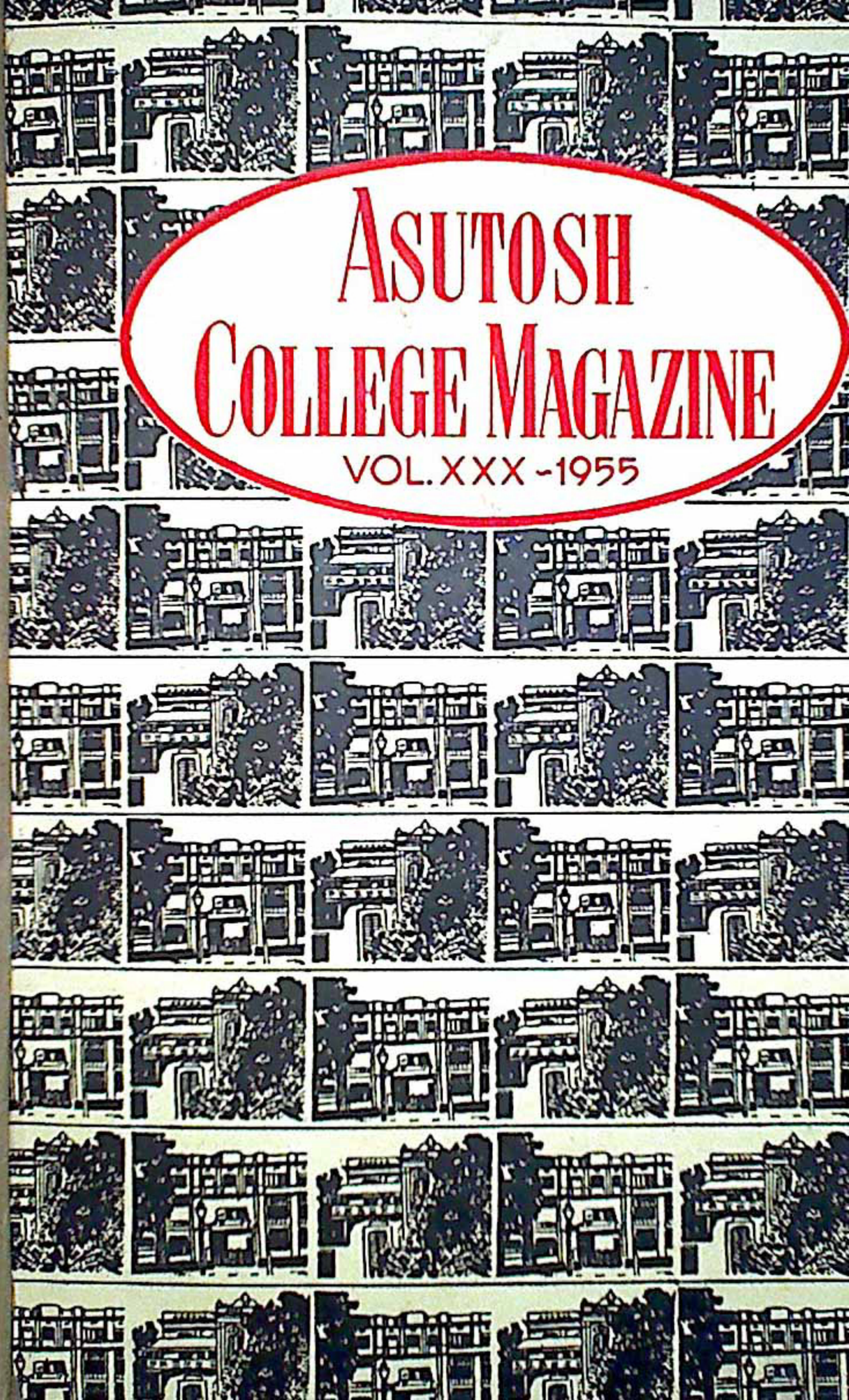

ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

VOL. XXX - 1955

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

• ত্রিংশ খণ্ড •

॥ ১৩৬২ ॥

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সম্পাদক

শ্রীসমরেন্দ্র সেন

513

Printed and published by Dr. Bijon Bihari Bhattacharyya, M.A., D.Phil., M.L.C.
at Sri Gouranga Press Ltd., 5 Chintamani Das Lane, Calcutta - 9.

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়	শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	১
প্রবন্ধ		
রোল নাম্বার সিক্স্	শ্রীবিমল মিত্র	৪
আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে ও তার বিরুদ্ধে	শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু	৮
জীবনানন্দ দাশ-প্রসঙ্গে	শ্রীউৎপল বসু	১৬
আধুনিক কবি ও কাব্য	শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য	১৮
চর্যাপদ	শ্রীসুনীল মিশ্র	২৩
আধুনিক বাংলা সাহিত্যরচনার ধারা	শ্রীকিশোরীমোহন রায়	৩২
শরৎ-সাহিত্য-দর্শনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সম্ভব-পরিণতি	শ্রীদিলীপকুমার	৩৬
শিশু-রংমহল প্রসঙ্গে	শ্রীদীপক চাকলাদার	৪০
রম্যরচনা	শ্রীদীপ্তিপ্রসাদ মিত্র	৪৬
বিজ্ঞান এবং সাহিত্য	শ্রীজীবনাথ রায়চৌধুরী	৪৯
যাযাবর এবং তাঁর দৃষ্টিপাত	শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়	৫১
ভ্রমণকাহিনী		
বিদায়ী বর্ষ	শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭
দীঘায় একদিন	শ্রীনিমাইসুন্দর জানা	৬২
দার্জিলিঙে	শ্রীঅমল সান্যাল	৬৭
অবিস্মরণীয়	শ্রীমলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	৭১
মনীষী-জীবন		
আইনস্টাইন	শ্রীঅশোকবিকাশ ভট্টাচার্য	৭৪
গল্প		
ভিন	শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত	৭৬
দাবি	শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৮১
খুঁজে পাওয়ার শেষে	শ্রীপ্রশান্ত পাঠক	৮৭
বসন্তবাহার	শ্রীগৌর মুখোপাধ্যায়	১০০
হারজিৎ	শ্রীদীপককুমার রায়	১০৩
কবিতা		
যৌবন-বোধন	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	১০৫
বেতার : ১৯৪৩	শ্রীদিনেশ দাশ	১০৬

অন্ধকার	শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮
গণ্ডা	শ্রীসচ্চিদানন্দ সরকার	১০৯
মৃতদের দ্বীপ	শ্রীঅসীম সেনগুপ্ত	১১০
নদ নদী সমুদ্র	শ্রীউৎপলকুমার বসু	১১১
কলম চলেছে	শ্রীবাসুদেব গুপ্ত	১১২

Message		125
Editorial Notes	Sri Samarendra Sengupta	127
Reports		130
Problems in Present-Day Physics	Sri Ram Mihir Sen	134
The Study of Sanskrit	Sri Amalkumar De	136
Colours From Barks of Trees	Sri Shyamaprasad Sinha	140
Do you know	Sri Dipak Sengupta	142
Recent Additions to College Library		145

अभिवादन	विष्णुदेव राय	१५१
अपना-पराया	गिरिधारी तिवारी	१५३
हिन्दी में छायावाद	रामअधार मल्ल	१५६
पुकार	हरजीत सिंह	१५९
संत-साहित्य में तुलसी	मौजीलाल सिंह	१६२

চিত্র সূচী

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ॥ অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে লিখিত
দীঘা
দীঘায় সমুদ্রোপকূলে
খেলাধূলা
আলোছায়া
আশুতোষ কলেজ ছাত্র-সংসদ ॥ ১৯৫৪
Asutosh College Cricket Team : 1954-55
Asutosh College Rowing Team : 1954-55
Justice Sri Ramaprasad Mukherjee
Inter-Collegiate Body Building etc.
Best Platoon etc.

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL

কল্যাণীয়েষু

শিল্পী, তোমাদের দিয়ে যে
সব দেহ [illegible] তৈরি তুমি তাদের
মৃন্ময় করেছ। অর্থাৎ মানুষের মূর্তি যে
সব তাকে তুমি মানুষের শরীরতত্ত্বের উপাদের
মতো [illegible] তাও। অতঃপর মানুষের নিজ
আমার সামনে সৃষ্টি করে। [illegible] করেছ

আমার প্রাণের এই [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ
[illegible] [illegible] [illegible] আমাকে [illegible] করেছে।
আমার এ প্রসঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] এ সম্বন্ধে
একথা বলি কি — স্বতঃস্ফূর্ত [illegible]
[illegible] [illegible] আছে — [illegible] [illegible] [illegible]
আমার [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible]" [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ভুল করেও চিত্রকলায় প্রবেশ
হল, [illegible] আমার [illegible] যদি সেই [illegible] [illegible] করে
[illegible] [illegible] হয়। ইতি ২১/১১/৩৮ শ্যামলী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥❁॥ আশুতোষ কলেজ ॥❁॥

॥ ❁ ॥ পত্রিকা ॥ ❁ ॥

ত্রিংশ খণ্ড ❁ ❁ ১৩৬২

সম্পাদকীয়

সৃষ্টির মূলে যে গভীর জীবনবোধ নিয়ত তরঙ্গায়িত, যে জীবনবোধ মৃত্তিকার প্রতি অণুপরমাণুতে—সে জীবনবোধ ও জীবনবেদের সার্থক স্বাঙ্গীকরণ ব্যতিরেকে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক-কালের বাংলা সাহিত্যে শুধুমাত্র ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানোর সাহিত্যের শৌখিন মজদুরির যে ব্যাপক ঢেউ বাংলা ভাষার বেলাভূমিতে এসে প্রতিনিয়ত আঘাত করছে সেটা সংবেদনশীল প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীকেই চিন্তান্বিত করে তুলবে। স্বল্পায়ু বাঙালীর মতো স্বল্পায়ু সাহিত্য-বিষয়ক পত্র-পত্রিকাগুলির অবস্থা দেখলে সত্যিই ভাবনাকুল হয়ে উঠতে হয়। বাংলার যুবসমাজ কি আর প্রগতিশীল সৃষ্টিতে পারংগম নয়?

চিরাচরিত নিয়মের নিয়ামক হিসাবে প্রতি বছরই সম্পাদকের দপ্তরে রাশি রাশি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি জমে ওঠে। দুঃখের বিষয় বেশীর ভাগই অপাঠ্য—প্রতিশ্রুতি তো দূরের কথা, আন্তরিক প্রচেষ্টারও দেখা মেলা ভার, কারণ চেষ্টা যেখানে আন্তরিক সাফল্য সেখানে বহুদূরলক্ষ্য নয়। গতানুগতিকতার পথ অতিক্রম করে সত্যিকারের সাহিত্য-সৃষ্টির পেছনে যে বিরাট প্রস্তুতি ও সচেতন গভীর অনুশীলন থাকা প্রয়োজন সেটাই স্রষ্টার অন্বিষ্ট হওয়া উচিত। সাহিত্যের রাজপথে পদপাতের পূর্বে এ সত্যটার সম্পর্কে আমরা প্রত্যেককেই অবহিত হতে বলি, অবহিত হতে বলি প্রাচীন ঐতিহ্য-বিষয়ে—যে ঐতিহ্য বহু জ্ঞানী-গুণীর একনিষ্ঠ সাধনায় পরিপুষ্ট। ভাব ও ভাষার কারুকর্মের সার্থক যুগ্ম পুষ্পায়ন ব্যতীত চিরন্তন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।

কবি জীবনানন্দ দাশ-এর আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যুতে প্রত্যেক বাঙালী কাব্যামোদী

মর্মাহত। 'কল্লোল'-যুগ থেকে যে কবির কাব্যজীবনের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল, উত্তরোত্তর তা মহান্ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন ক'রে, 'বনলতা সেন'-এ পেয়েছিল সার্থক পরিণতি। ইংরেজ কবি 'ইয়েট্স্'-এর মতো বাংলা কবিতায় 'ইমেজ' বা চিত্রকল্পের সার্থক প্রচলনে তাঁর কাব্য মহিমান্বিত। তাঁর মৃত্যু বিশেষভাবে শোকাবহ এইজন্যে যে, শেষের দিকে তাঁর কবিমানসের গতিমুখ-পরিবর্তনের একটা স্পষ্ট আভাস দেখা দিয়েছিল। সেটা তাঁকে আরো মহত্তর কবিতার জনক করত বলেই আমরা বিশ্বাস করি। জীবনানন্দের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৪৭-৫৪ সালের শ্রেষ্ঠ বাংলা কাব্যগ্রন্থ বিবেচিত হয়েছে। এ সাফল্য তাঁর সুদীর্ঘ সাধনার সার্থক পরিণতি।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আর ফিরবেন না আমাদের মধ্যে। তাঁর মৃত্যুতে, আধুনিক কবিগোষ্ঠী ব্যতীত, প্রাচীন ও নবীন কবিদের সেতু-স্বরূপ উল্লেখ করবার মতো মৌলিক কবি, জীবিত রইলেন না।

স্বর্গত কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন, সুদীর্ঘকাল আন্তরিকভাবে বাংলা কাব্যকে সেবা করবার ইতিহাস। আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রাচীন কবি ছিলেন তিনি।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 'পেনিসিলিন'-আবিষ্কর্তা স্যার আলেক্জাণ্ডার ফ্লেমিং-ও আর ইহজগতে নেই। তাঁর এই মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি হল।

এ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছেন 'আরোগ্য-নিকেতন'এর জন্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'কৃষ্ণকলি ও ইত্যাদি গল্প'র জন্য 'পরশুরাম'। এ যোগ্য সম্মানে বাংলা ভাষা সম্মানিত।

এ বছরের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাম্মানিক পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন আমেরিকার আর্নেস্ট হেমিংওয়ে—একটি ধীবর-জীবনের বিচিত্র আশা-নিরাশার অভিজ্ঞতার বর্ণনামুখর 'ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' বইটির জন্য।

আমাদের কলেজের ছাত্র শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তঃকলেজ সংগীত-প্রতিযোগিতায় বারোটি বিভাগের নয়টিতে প্রথম স্থান অধিকার করে বিজয়ী হন। এ জাতীয় সংগীত-প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এ সাফল্য অভূতপূর্ব।

কলেজের ব্যায়ামাধ্যক্ষ শ্রীসরসীকুমার গাঙ্গুলীর সযত্ন শিক্ষাদানের ফলে এ বছর আমাদের কলেজ শ্রেষ্ঠ দেহী ও ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার

করেছে। বর্তমান বাংলায় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন যা সেটা হল—স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, কর্মঠ যুবকের।

অন্যান্য বছরের মত এবারেও আমাদের কলেজ ক্রীড়ার বিভিন্ন বিভাগে সাফল্য লাভ করেছে। এজন্য ক্রীড়া-সম্পাদক শ্রীপৃথ্বীশ বসু ধন্যবাদার্হ।

পৃথিবীর বুকে 'হাইড্রোজেন বোমা'র যে বিভীষিকা ঘনিয়ে এসেছে তা প্রত্যেক দেশের শান্তিকামী মানুষকে চিন্তান্বিত করে তুলবে। জাপানের সন্নিকটে কিছুদিন আগে যে পরীক্ষা হয়ে গেল সে পরীক্ষার ফলে সৃষ্ট 'ছাই'এ প্রাণ হারিয়েছে নিরপরাধ কয়েকজন জাপানী ধীবর। মৃত্যুর পূর্বে তাঁদের আন্তরিক কামনা ছিল, পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার নিষিদ্ধকরণ। এই ইচ্ছা যেন প্রতি বিশ্ববাসীর মনে সংক্রামিত হয়—এই আমাদের প্রার্থনা।

বহুযুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীতে, সভ্য মানব-সমাজে আমাদের একমাত্র কাম্য শান্তি। স্বল্পসংখ্যক মানুষের যে লোভ, যে জিঘাংসা আকাশপ্রমাণ হয়ে চিকিয়ে উঠে পৃথিবীর ভাগ্যাকাশকে আবার যুদ্ধের মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—আমরা এর দৃঢ় প্রতিবাদ করি।

পত্রিকাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, হয়তো তবুও অনেক কিছু দোষ রয়ে গেল। সাধ হয়তো ছিল অনেক, কিন্তু সাধ্য ছিল না। এর জন্য আমি প্রত্যেক ছাত্রবন্ধুর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এবারে যে দোষ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা চোখে পড়বে তা আগামী বারে যেন না থাকে, সেজন্য এখন হতে সচেষ্ট হতে।

পত্রিকা-সম্পাদনায় যিনি নানাভাবে উপদেশ দিয়ে একান্ত আপনজনের মতন সাহায্য করেছেন সেই শ্রীসুরেশচন্দ্র দে মহাশয় ও অন্যান্য অধ্যাপকদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ছাত্রবন্ধু শ্রীদীপ্তিপ্রসাদ মিত্র, শ্রীসুজিত ঘোষ ও শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্তকে। শ্রীরথীন রায় (দ্বিতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান), শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীনিতাই দত্তের (চতুর্থ বর্ষ, সাহিত্য) তিনটি আলোকচিত্র এই পত্রিকায় টেলপিসরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ক্রীড়াবিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের সৌজন্যে 'পেলাধুলা'র ছবিগুলি পেয়েছি। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেই-সমস্ত প্রাক্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও বর্তমান ছাত্রবন্ধুদের, যাঁদের সবল সহযোগিতার স্বাক্ষর রয়েছে বর্তমান সংখ্যার প্রতিটি পৃষ্ঠায়। নমস্কারান্তে

শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

রোল নাম্বার সিক্স্

রোল নাম্বার সিক্স্, রোল নাম্বার সিক্স্—

তখন আমাদের ব্রিটিশ হিস্ট্রি পড়াতেন অমলচন্দ্র রায়চৌধুরী। দীর্ঘদেহ সুদর্শন চেহারার মানুষ। কোনো দিকে চেয়ে দেখেন না। ঘড়ির কাঁটার মত নিয়ম করে ক্লাসে আসেন। অন্য ক্লাসে যা-ই হোক, এখানে গোলমাল করা চলবে না। ইতিহাস নয় তো, উপন্যাস। ভারি উপাদেয় তাঁর লেক্চার। অন্য কলেজ থেকে পর্যন্ত ছাত্ররা শুনতে আসে লুকিয়ে লুকিয়ে। তিনি এসেই রোল কল্ করতে শুরু করেন—ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ্, সিক্স্—

ছ'নম্বরে এসেই একবার থামলেন। সামনের দিকে চেয়ে আবার ডাকলেন—রোল নাম্বার সিক্স্—

প্রথমবার কে যেন বলেছিল—ইয়েস্ স্যার। কিন্তু দ্বিতীয়বারের ডাকে আর সাড়া শব্দ নেই।

প্রক্সি-দাতা তখন সভয়ে আত্মগোপন করেছে।

অমলবাবু আবার একবার ডাকলেন—রোল নাম্বার সিক্স্—বিমল মিত্র ?

চোখ দুটো সারা ক্লাসের চৌহদ্দি ঘুরে এল। কোথাও নেই অপরাধী।

অমলবাবু বললেন—বিমলকে একবার দেখা করতে বোলো তো আমার সঙ্গে। আমার বিশেষ দরকার আছে। ভয় নেই, বকব না তাকে।

অপরাধী এ-সবের কোনো খবরই রাখে না। কলেজের উল্টোদিকে হাজরা পার্কের একটি নির্জনতম কোণে তখন ভীমপলশ্রীর ঠুংরি চলেছে। গায়ক অনুপম ঘটক আর শ্রোতা আমি। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার আর্টস্-এর ছাত্র হলে কী হবে, রসের কারবারে দুজনেই আমরা তখন প্রায় মহাজন। প্রাক্-যুদ্ধের কলকাতা শহর। রেশন, কণ্ট্রোল, কিউ -এর তখন নাম-গন্ধ পর্যন্ত কেউ শোনে নি। অনুপম গান গায় আর আমি রসের যোগান দিই। অনুপম ঘটকের ভবিষ্যৎ তখন প্রায় সুনিদিষ্ট। একদিন গানের ওস্তাদ হবে সে, এই তার অভিলাষ। আর আমি ? আমার কামনা বড় গোপনীয়। কেউ জানে না। আমি নিজেও তখন মতিস্থির করতে পারছি না। জীবনের সঙ্গে শিল্পবোধের তখনও বিরোধ-নিষ্পত্তি হয় নি পুরোপুরি। এমন সময় এই কাণ্ড।

রচনা যে কয়েকটা কাগজে তখন না বেরিয়েছিল তা নয়। তবে যারা জান তেমন উৎসাহ দেয় নি। গুরুজনস্থানীয় লোকেরা বিশেষ কেউই জানতেন না। কেউ জানলেও বালখিল্য বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন। কেবল আমার এক প্র টিউটর, কালীপদ চক্রবর্তী মশাই—যিনি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে হত প্রায় প্রতিদিনই আমার অভিভাবকের কাছে নালিশ করতেন—সেই তিনিই কী কেমন করে আমার একটা কবিতা হঠাৎ দেখে ফেললেন। তখন বোধ হয় ক্লা পড়ি। কী দয়া হল তাঁর কে জানে, একখণ্ড 'গীতাঞ্জলি' নগদ মূল্যে কিনে উপহার দিয়ে ফেললেন। বললেন—না, তোমার দেখছি ভাব আছে।

কিন্তু এমন উদাহরণ খুঁজলে সারা জীবনে বড়জোর একটা কি দুটো লৌভাগ্যক্রমে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বা মানুষের সংসারে সারা জীবন নিরুৎসাহ লোকের কখনো অভাব হয় নি আমার। সেই বয়সেই নিন্দে, অবজ্ঞা আর অ পেতে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আস্তে আস্তে নিজেকে জনতা, সভা ভীড় থেকে সরিয়ে অন্তরালে বাস করার স্বভাব প্রায় মজ্জাগত হয়ে গি প্রশংসা করলে সন্দেহ হত, ভয় হত। তাই ক্লাসের ছেলেদের মুখে যখন শুনলাম যে অমলবাবু ডেকেছেন মনে ভয়ই হল—হয়তো বকুনি খেতে হবে পেতে হবে প্রক্সির ব্যবস্থা করবার জন্যে।

ঠিক করলাম, দেখা করব না। না হয় হিস্ট্রির ক্লাসে বরাবরই গর-হাজির নিন্দে, অপবাদ, অবহেলা, শাস্তির বোঝা সাধ করে আর বাড়াব না। আম আর মুখ চিনে তিনি বসে নেই। ক্লাসে হাজির না হলেই হল।

এরই দু-চার দিন পরের কথা। পুরোনো আশুতোষ কলেজের সামনে তখ খানিকটা জায়গায় বাগান ছিল। সেই বাগানের পাশে কলেজে যাওয়ার রাস্তা সেদিন দু-তিন জন বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি। ক্লাস তখনো বসে নি আর কি।

হঠাৎ কানে এল—বিমল, আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে একবার কোরো তো।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি অমলবাবু। নিঃশব্দে পাশ দিয়ে যেতে যেতে ব বললেন। সর্বাঙ্গ ভরে থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। এতদিন পরেও এখ রেখেছেন নাকি! চিনতেই বা পারলেন কী করে?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পেছন পেছন গেলাম। তিনি সোজা রাস্তা দিয়ে

লাইব্রেরিতে গিয়ে বসেছেন। আমি অপরাধীর মত দাঁড়ালাম সামনে গিয়ে। বললাম—আমায় ডেকেছিলেন স্যার আপনি?

তিনি বললেন—হ্যাঁ, 'ভারতবর্ষে' তুমি একটা গল্প লিখেছ?

'ভারতবর্ষ'! লিখেছি আর কোথায়, পাঠিয়েছি বটে! কিন্তু সে তো কারো জানবার কথা নয়। যদি কেউ জেনে থাকে তো জেনেছে একমাত্র পোস্টাপিসের পিওন। আর সে তো এখনো ছাপাই হয় নি। হবে কি না তাই বা কী করে জানব!

সবিনয়ে বললাম—একটা গল্প পাঠিয়েছিলাম ওখানে।

অমলবাবু বললেন—সেটা ছাপা হবে। এ মাসেই বেরোবে।

এসেছিলাম শাস্তির আশঙ্কা করে, কিন্তু এ যে সেই নাকের বদলে নরুন। তবু মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরল না। জিজ্ঞেস করতে পারলাম না অমলবাবু 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কে! সম্পাদক তো জলধর সেন। অমলবাবু তো সাহিত্যিকও নন যে খবর জানতে পারবেন। ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না।

অমলবাবু আবার বললেন—কাগজ বেরলে তুমি সম্পাদকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসো।

টাকা! শুধু সোনা নয়, আবার সোহাগা! রাজকন্যাই নয়, আবার অর্ধেক রাজত্বও!

বললেন—হ্যাঁ, প্রথম লেখার জন্যে ওঁরা টাকা দেন না বটে, তবু তুমি পাবে। কিন্তু—

বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তার পর বললেন—কিন্তু, তুমি ও-রকম অশ্লীল লিখতে গেলে কেন? লেখাটা আমি পড়েছি, তুমি লিখতে পারবে একদিন, কিন্তু তুমি তো এখনো দেখতে শেখ নি—বস্তুকেই দেখেছ কেবল, বাস্তবকে তো দেখ নি; শুধু factই দেখেছ, truth তো দেখ নি—ও দুটোতে যে অনেক তফাৎ।—কিছু মনে কোরো না, তুমি আমার ছাত্র বলেই তোমাকে বলছি—

আমার মুখের দিকে চেয়ে আবার বলতে লাগলেন—পৃথিবীটা তো ধুলো মাটি রক্ত মাংস ক্ষুধা দিয়ে তৈরী, কিন্তু এ পৃথিবীতে যা-কিছু দেখি সবটাই কি পার্থিব? ভুলে যেয়ো না, শিল্পীর কারবার পৃথিবীকে নিয়ে নয়, পার্থিবকে নিয়ে। পৃথিবীর সঙ্গে পশুর যোগ শুধু খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধ নিয়ে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তা নয়। মানুষ যেমন পৃথিবীর কাছ থেকে নানা ভাবে নেয়, তেমনি পৃথিবীকে নানা ভাবে মানুষের যে দিতেও

হয়। দিতে হয় মানুষের সৌন্দর্যবোধ, কল্যাণকামনা, শিল্পসৃষ্টি।···নইলে শুধু খাওয়া-পরার সম্বন্ধটুকু নিয়ে থাকলে মানুষ হিসেবে তো পঙ্গু হয়ে যাবে একেবারে—সত্যিকারের মানুষ আর হতে পারবে না···

এমনি অনেক কথা বলে গেলেন তিনি। কিছু বুঝলাম, কিছু বুঝলাম না।

আসবার সময় বললেন—এত কথা বললাম বলে কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার ছাত্র বলেই বললাম। অচিন্ত্য, প্রেমেন, মনোজকেও আমি এমনি কথাই বলেছি। তার পর আমায় বললেন—আচ্ছা, এখন যাও।

ফিরে এলাম। কিন্তু মনে আছে, তার পর দিন-সাতেক যেন একেবারে মগ্নচৈতন্য হয়ে রইলাম। যতদূর মনে পড়ে এ বোধ হয় ১৩৪০ সালের কথা। ভারতবর্ষের সে গল্পটাও আমার আজ হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে বলে অবশ্য আমার কোন দুঃখও নেই। অনেক কিছুই তো হারিয়েছি। অনেক বন্ধু যেমন হারিয়েছি, অনেক শত্রুও তো হারিয়েছি। অত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী আমার আশুতোষ কলেজে আর কেই বা তখন ছিল। আমি অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবহেলিত একজন ছাত্র। আমি অনেকবার ভেবেছি, আমার ওপর এ-স্নেহ তাঁর কেন হয়েছিল? গেজেটে আমার পাশ করার খবর পেয়ে অযাচিত অভিনন্দন-পত্র পাঠিয়েছিলেন। হয়তো আমার ওপর অনেকখানি আশা করেছিলেন তিনি। তাঁর আশা আমি পূর্ণ করতে পারি নি জানি। একদিন তিনি দেখে গেছেন আমি লেখাই ছেড়ে দিয়েছি, আমাকে পাঠক-সম্পাদক সবাই ভুলে গেছে। তাঁর জীবদ্দশায় আমি 'রোল নাম্বার সিক্স্' হয়েই ছিলাম কেবল। সে-কাহিনী আমি আমার 'কন্যাপক্ষ'তে লিখেছি।

তার পর কবে আশুতোষ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ, পোস্ট্ গ্র্যাজুয়েট পেরিয়ে এসে একদিন হঠাৎ শুনলাম, তিনি আর নেই। শুনে স্বার্থপরের মত নিজের অভাবটাই বড় করে বাজল। আজ মনে হয়, সমস্ত লোকালোকের ঊর্ধ্বে যেখানেই তিনি থাকুন—তাঁর প্রসন্ন-দৃষ্টি যেন আজও আমার ওপর বর্ষিত হচ্ছে। আমি তাঁর অন্যতম নগণ্য ছাত্র—তাঁর রোল নাম্বার সিক্স্। তাঁর অচিন্ত্য, প্রেমেন, মনোজের মত আমি হই নি, হতে পারি নি, কিম্বা হয়তো হতে চাই নি! কিন্তু তা বলে তাঁর আশা কি সত্যিই বিফল হয়েছে?

আজ তিনি জীবিত নেই। থাকলে এই প্রশ্নটাই করতাম।

বিমল মিত্র
প্রাক্তন ছাত্র

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে ও তার বিরুদ্ধে

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল দুর্বোধ্যতা। সহজ সাধারণ বুদ্ধিগম্যতার লগি দিয়ে আজকালকার কবিতার তল পাওয়া যায় না। দুরূহ শব্দসম্ভার, উৎকট এল্যুশন -কণ্টকিত উন্নাসিকতা, বিদেশী জীবন ও চৈতন্য থেকে আহৃত রূপকালংকার—ইত্যাদির দ্বারা কাব্যের কায়াগঠন এমনই জটিল হয়ে উঠেছিল—যা দেখে সুস্থ বাঙালী পাঠক মাত্রই শিউরে উঠতে বাধ্য। বিদেশী ছাঁচে বাংলা ভাষার মাটি দিয়ে যতই কাব্যের শরীর তৈরী হোক না কেন—তাকে চট্ করে পরিচিত বলে বোধ হবে না; বিদেশী পট ও পটভূমির সঙ্গে স্বত্বতা নিবিড় হলে ঐ মূর্তিকে চেনা-চেনা ঠেকলেও কোন্ লিঙ্গেত্তের কোন্ দেবতাকে যে মূর্ত করা হয়েছে, তার সম্যক্ পরিচয় উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা কবিতার খ্যাতি ও খাতির আশানুরূপ বাড়তে পায় নি। অবশ্য এ কথা এই শতকের তৃতীয়-চতুর্থ পাদ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

পাঠককে সাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন অ্যাভারেজ মানুষ হিসেবে ধরতে হবে। এবং তাঁর এই অ্যাভারেজ মনকে মাতিয়ে দিতে না পারলে কবিতাসৃষ্টির অপূর্বতা নষ্ট হবেই—এই ধরনের ব্রত বা নিষ্ঠা কবির অন্তর্লগ্ন হয়ে থাকবে, যার ফলে কবির মুখ্য প্রচেষ্টা হবে, তাঁর রচনার দ্বারা ঐ অ্যাভারেজের প্রাণমনকে ভরিয়ে তোলা। কবি নিজে হয়তো সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী মননশীল, ধীমান্ ও প্রজ্ঞাবান্। ফলে বুদ্ধির মারপ্যাচ খেলে, কথার যুযুৎসুতে সুবিশাল পাঠ-পরিধির ব্যাপ্তির দ্বারা অ্যাভারেজ পাঠককে হারিয়ে দিতে তাঁর এক মুহূর্তও দেরি হবে না। কিন্তু কাব্যের কাজ তো তা নয়। ধাঁধা যা করে, কবিতাকে যদি সেই দাস্য করতে হয়, তবে পাঠক অপেক্ষা কবিরই বেশী লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য মাত্র যে, একদা—এই কিছুদিন আগেও—বাঙালী কবিকুল বুদ্ধির মারপ্যাচেই কাব্যপ্রাণ জয় করার চেষ্টায় আত্মনিযুক্ত ছিলেন। তাই আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ও ব্যাপক অভিযোগই ছিল দুর্বোধ্যতা। কবিতা—পড়া যায়, কিন্তু বোঝা যায় না। ছন্দের মাধুর্য খসে গেল, প্রযুক্তি ও প্রকরণের নিরাভরণ অঙ্গচর্চার ফ্যাশনে কাব্যশরীরের সৌকুমার্য দুর্লভ হল; প্রসঙ্গ ও অর্থ -ব্যাপারেও অনাচার দেখা গেল। সহজ অনুভূতি দিয়ে ছোঁওয়া ভাবনা-লোক কাব্যের জগৎ থেকে মুছে গেল। ফলে নিশ্ছন্দ কবিতার

দেহসৌষ্ঠবে নতুন গৌরব আরোপের জন্যে দুরূহ শব্দ যোজিত হতে থাকল, প্রসঙ্গের মধ্যেও অর্থ-কৌলীন্য বা আভিজাত্য আনার জন্যে কবি তাঁর মনকে বন্ধ করে মননের কপাট খুলে দিলেন। তাঁর জানার রাজ্যে যে-সব চিন্তা-ভাবনা সঞ্চিত ছিল, সবই কাব্যরূপে পরিবেশিত হল।

কবি জানেন প্রচুর, এবং যেহেতু সাহিত্য-নির্মাণের প্রধান কথা নূতনত্বের অবতারণা, ভাবে বা ভাষায়, অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে তো নতুন কিছু দিতেই হবে, তাই কবির জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে নূতনত্বের রূপ নিয়ে যে-সব উপকরণ কবিতার আকারে আসে, তার সঙ্গে পরিচয় সকলের থাকা সম্ভব হয়ে ওঠে না, ফলে কাব্য দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। 'জুলেখার মতো তুমি এলে সখি, নর্মসখি, আমার অন্তরে' বললে অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয় না। জুলেখার স্থানে ক্রেসিডাকে আনা যায়; এইরকম আফ্রোদিতি, বারবারা বা আরো কোনো নাম। প্রেমের আবেগের মূলানুসন্ধান-প্রসঙ্গে কবি যদি 'কামনার লিবিডো'র কথা বলেন—তবে কবিতা সাধারণ্যে দুর্বোধ্য হতে বাধ্য।

এই-সব এল্যুশনের দ্বারা কাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করে না বলেই আমার বিশ্বাস। পথ চলতে যদি প্রতিপদেই কাঁটা ফোটে, তবে পথিপার্শ্বের অনুপম দৃশ্যবৈচিত্র্যে মন মুগ্ধ হতে পারে না। যদি প্রতি পংক্তির শব্দার্থের জন্যে অভিধান হাৎড়াতে হয়, আর এল্যুশনের জন্যে দৌড়োদৌড়ি করতে হয় বিদ্বৎসমাজের কাছে—তবে কাব্যপাঠ আনন্দের বস্তু হয়ে ওঠে না।

অথচ দেশী কাহিনী, ঘটনা বা চরিত্রের উপস্থাপনের দ্বারা এল্যুশনের কাজ করিয়ে নেওয়া চলে—তাতে পাঠককে পরিশ্রান্ত ক'রে ক্লিষ্ট ক'রে তার কাব্যপাঠস্পৃহাকে নষ্ট করাও হয় না।

দুর্বোধ্য করে মনোভাব প্রকাশের স্বপক্ষে বিংশ শতকের একদল কবি বেশ চমৎকার একটি যুক্তির অবতারণা করে থাকেন! তাঁরা বলেন—কাব্যসৃষ্টির মূলে রয়েছে মনের ভাবতরঙ্গের অনুরণন। মন যে ভাবে চিন্তা করে থাকে তার যথার্থতা যদি প্রকাশ করতে হয়, তবে তাকে সজ্ঞায় বদ্ধ করলে তার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হতে বাধ্য! মনের ভাবনারাশি এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ও পারম্পর্যবিহীন। তাই কবিতাকেও কিছুটা অবচেতন মনের বিশৃঙ্খলতার সম্মুখীন হতে হবে, চিন্তার পারম্পরিকতা রক্ষা করাও মুশকিল হবে।

এই যুক্তির বিরুদ্ধে বহু কথা বলা হয়েছে, এবং অবশেষে এই রকম ঠিক হয়েছে যে, আধুনিক কবিতা যদি অর্থ-সংলগ্ন না হয় তবে তাকে পাগলামিই বলতে হবে। চিন্তার

পারম্পর্য থাকে না একমাত্র উন্মাদ ব্যক্তির, এমন-কি উন্মাসিকতার মধ্যেও চিন্তা-ভাবনার একটা ধারাবাহিকতা দেখতে পাওয়া যায়। এইরকম ভাবে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হবার ফলে আধুনিক দুর্বোধ্য কবিরা সুবোধ বালকের মতো অর্থবহ বাণী-বিন্যাসেই মনোনিবেশ করেছেন।

এ যুগের একমাত্র বাণী হচ্ছে—সমস্ত মানুষের কল্যাণ করার কথা, সর্বমানবের উন্নয়নের কথা, জনসাধারণের বিভিন্নতা ঘুচিয়ে তাদেরকে একীকরণের কথা। সেই যুগে বেশী মানুষ যা বোঝে না তার দাম যে বিশেষ কিছু নেই—এ কথাটি আধুনিক দুর্বোধ্য কবিকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়েছে। এবং তারই ফলে আজকের আধুনিক কবিতা দুরুচ্চার্য দুর্বোধ্যতার পন্থানুসরণে ক্ষান্ত হয়েছে।

অবশ্য আধুনিক কাব্যের দুর্বোধ্যতার পক্ষে যে একেবারে কোনো কথা নেই তা নয়। রবীন্দ্রনাথের পর বহু কবিরই প্রধান চেষ্টা এইরকম হয়ে দাঁড়াল যে রবীন্দ্রানুসৃত পথে তাঁরা চলবেন না; নতুন দিকে, নতুন জরিপের সাহায্যে নতুন পথ প্রতিষ্ঠা করে তাঁরা চলবেন। আবিষ্কারে আকুল কবিকুলের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হল—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে। এই পরীক্ষার যুগে সব কাব্যই যে আভিধানিক সুষ্ঠুতায় রচিত হবে—তা দাবি করা বা আশা করা অন্যায়। পরীক্ষা-যুগের কবিতা তো চিরদিন থাকে না, কিন্তু নতুন একটা যুগের সংকেত ও সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলে সে মুছে যায়। জোয়ারের জলের সঙ্গে বহুবিধ আবর্জনা ভেসে আসে বটে, কিন্তু পরে ভাটার টানে ওই-সব ময়লা অপসৃত হয়ে যায়, পলিমাটি আর উর্বরশক্তিই থেকে যায়। জোয়ারের স্রোতে যাদের কল্যাণকর আগমন আদৌ টের পাওয়া যায় নি—তারাই শেষ পর্যন্ত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তেমনি নিরীক্ষা-যুগের কাব্যস্রোতে দুর্বোধ্যতার আবর্জনা ভেসে এলেও শক্তিমান কবির প্রাণে আধুনিকতার পলিমাটির আশীর্বাদকে পৌঁছে দিয়ে যায়।

আধুনিক কাব্যের বিরুদ্ধে আর একটি বড় অভিযোগ হচ্ছে যে, আজকের কবিরা বড্ড বেশী অনুকরণপ্রিয়, আর তাঁদের এই অনুকরণ তাঁরা অনুবাদের মধ্যে দিয়েই করে থাকেন। সংক্ষেপে বললে অভিযোগটি এই রকম দাঁড়ায় যে, আধুনিক কাব্যে অনুকরণ-বাদ ব্যাপকভাবে চলেছে। কাব্যের ছোট ছোট মনোরম উপলব্ধির ব্যঞ্জনা, কি নয়নাভিরাম চিত্রসৃষ্টি—এ-সবের অনেকগুলির মূলই নাকি ইংরাজী কাব্য বা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাওয়া অন্য বিদেশী কাব্য। আজকালকার কিছু কিছু কবিতা পড়লে অবশ্য এইরকম

একটা তরল সন্দেহ মনে উপস্থিত হতে পারে। শব্দসৃষ্টি, চিত্রনির্মাণ—অর্থাৎ কথা ও ছবির মাধ্যমে ছোট্ট ইমেজরির চমৎকারিত্ব—যেন খাঁটী বাঙালী বলে মনে হয় না। এর পেছনে বৈদেশিক বর্ণগন্ধ যে লেগে থাকে না তা নয়। কাব্যের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বিষয়বস্তু বা কবির উপলব্ধি—যাকে মুড বলা যেতে পারে—তাই যে কখনো কখনো একান্তভাবে ধরা পড়ছে না তা নয়, বলবার কায়দা পর্যন্ত হুবহু অনুকৃত হতেও দেখা যায়। এইজন্যেই অনুকরণের অপবাদটা এমনই প্রবল।

এই অনুকরণ-বাদ বর্তমান কাব্যক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে দেখা যায়। একদা এলিয়ট, পাউণ্ড, কামিংস্ প্রমুখ কবিরা অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান্ আধুনিক কবিদের কাছে অতিপূজনীয় ছিলেন—এবং এঁদের দেখানো পথে চলতে, কপ্‌চানো মতে সায় দিতে, এতটুকুও সংকোচবোধ করতেন না। উক্ত কবিকুলের রচনায় রীতিমত দুর্বোধ্যতার নিশেল ছিল। আমাদের দেশের বরেণ্য কবিগণও দুর্বোধ্যতাটুকু পর্যন্ত আরোপ করতেও দ্বিধা করেন নি—তা আগেই বলা হয়েছে।

এখানেও বলা যেতে পারে যে, নতুন একটি ছাঁচ আমদানি করার প্রয়োজনে অনুবাদ জিনিসটা মন্দ নয়। সুতরাং জাগতিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে যদি আমরা আহরণ করতে পারি তবে ক্ষতি কি? আর একটি কথা। অনুবাদ করে থাকেন বলে যে-সব কবিদের নির্দিষ্ট করা হয়, তাঁরা কি সত্যিই অনুবাদ করাতেই নিজেদের কবি-কর্ম সীমিত করে রেখেছেন? না, অনুবাদ ছাড়াও নিজেদের স্বকীয়তার ফসলে চিন্তার ভাণ্ডার ভরেছেন?

এইখানে একটি অপ্রিয় কথার অবতারণা করতে হচ্ছে। অভিযোগকারীদের বলতে শুনেছি যে, কবি যদি বলেন যে অমুক কবির অমুক কবিতা এখানে মুক্ত অনুবাদ করে দেওয়া হল—তা হলে গোলমাল মিটে যায়। কিন্তু পরদ্রব্যেষু তাঁদের এমন গভীর আসক্তি দেখা যায় যে তাঁরা উক্ত দ্রব্যসম্ভারকে একান্ত আত্মীয় বলে মনে করে থাকেন ও ভাষার খোলস বদলে আত্মজ বলে চালাতে কুণ্ঠিত হন না। অর্থাৎ, আধুনিক কবির অনেক কবিতাই 'গোরা'র মতন বাঙালী।

আমি কিন্তু এই অভিযোগটি সম্পর্কে একমত হতে পারি না। এক-আধজন কবি এক-আধটি কবিতাকে আত্মসাৎ করে থাকবেন—তা বলে আধুনিক কবিকুলের সামগ্রিক কলঙ্ক কখনোই এ নয়। কি করেই বা এ ব্যাপার সম্ভব। কবিতাকে যে কবির মনেই জন্মাতে হবে, বাইরে থেকে চাপালে তো তার জাত যাবে, কাব্যত্ব নষ্ট হবে। বিদেশী খাপে দেশী খড়্গ যেমন অশোভন—তেমনি ইয়োরোপীয় মানসভূমিতে জাত যে-সব

ইমেজরি—তাদের মাধ্যমে বাঙালী কবির উপলব্ধির প্রাসাদকে সজ্জিত করাও অবাস্তব। এইরকম অভিযোগকারী এক হীন কুচক্রী বিশ্বনিন্দককে বলতে শুনেছি যে, এই যুগের অতিবিখ্যাত—রবীন্দ্রোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবিতা বললে যার এতটুকু অত্যুক্তি করা হয় না সেই—'বনলতা সেন' কবিতাটিও নাকি বিদেশী কোনো কবির ভাবনাসঞ্জাত ফসল থেকে আহৃত। (এই কুৎসাকারী নিন্দক, বিদেশী কবির নাম, কবিতার ঠিকানা ইত্যাদি তাঁর উক্তির প্রমাণস্বরূপ হাজির করেন। সেটি পাঠ করার পর অভিযোগকারীর দিকে তাকিয়ে আমি ভেবেছিলাম—তাঁর মনন-ব্যাপারে কোথাও গোলমাল আছে। তাই আমি উক্ত ইংরাজী কবিতাটির নির্দেশ উল্লেখ করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করলাম না।)

কবিতার মনন কখনো চুরি করা যায় না। অন্তরে আবেগ আবর্তিত না হলে কাব্য কিছুতেই প্রাণময় হতে পারে না। পুরুষ নারীকে যে ভালবেসেছে—প্রেমের এই চিরন্তন বৃত্তির আবেগ আমাদের শ্রদ্ধেয় কবির আন্তর সম্পদ। তার জন্যে তাঁকে সমুদ্রপারের কবির কাছে ধর্না দিতে হয় নি।

আচ্ছা ধরুন, দিয়াশলাই না থাকায় আপনি একটি চার্চ্‌ম্যান্ কি নাইন্ নাইন্‌টি থ্রি সিগারেট কোনো পথচারীর কাঁচি সিগারেট থেকে কিম্বা হাফিজ আলির দোকানে তৈরী বিড়ি থেকে ধরিয়ে নিয়ে টানতে লাগলেন। এমন কোনো নিন্দক কি পৃথিবীতে আছে যে বলে বেড়াবে যে আপনি পথচারীর কাঁচি সিগারেট বা বিড়িই টানছেন? কোনো রচয়িতার একটি লেখা পাঠ করে যদি আমার মনে কোনো ভাবব্যঞ্জনার জন্ম ঘটে বা সুর মূর্ছিত হয়ে ওঠে—তবে কি আমাকে তাস্কর্যের জন্যে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে? অনুকরণ-বাদকে যাঁরা আত্মীকরণ-বাদের পর্যায়ে নামিয়ে এনে আধুনিক কবিদের তিরস্কার করেন, তাঁদের কাছে আমি শুধু উপরের সাদৃশ্য-রূপকটুকুই বিশেষ করে স্মরণ করার জন্যে বিনীত আবেদন জানাব।

আধুনিক কবিতার জগতে আর একটি জিনিসের খুব বেশী রকম সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। কবিতার রাজ্যে সর্বত্রই একটা ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট চীৎকার শোনা যাচ্ছে। আশাভ্রষ্ট, অসংহত, ঠিকানাহীন মানুষের আর্তনাদ ও অভিব্যক্তি আধুনিক কবিতার একটি বড় ভগ্নাংশকে ভরিয়ে তুলেছে। সমস্ত কিছুই যেন অগঠিত। আধুনিক কবির কাছে আকাশের নির্মল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না তাই রাশি রাশি কুষ্ঠের ক্ষতের মতো, পূর্ণচাঁদ পোড়া ঝলসানো রুটি বিশেষ, আর আধখানা চাঁদ কাস্তে! নগরীর রাজপথে দীপগুলিকে

কবি দেখলেন 'যেন সব চীনা গণিকার গালের মতন'। বঞ্চিত যৌবনকে আজকের কবিরা উপমিত করলেন 'ঘেয়ো কুকুরের অসহায় অভিব্যক্তি যেন'।

এই-সব উদ্ধৃতির দ্বারা একটি দিক মাত্র উদ্ঘাটিত করা যায় যে, আধুনিক কবিতার রাজ্যে কোনো কোনো মহলে সত্যশিবসুন্দর সম্পর্কে সজ্ঞান নজর দেওয়া হয় না। যাঁরা এই-জাতীয় রচনার বিপক্ষে গলা ছেড়ে গালি দেবেন তাঁদের সত্যশিবসুন্দরের দোহাই দিয়ে সাহিত্যবিচারের অতিপুরানো মানদণ্ডটি বের করতে বাধবে না।

তাঁদের সঙ্গে একমত না হলেও আমি বলতে বাধ্য হব যে, আধুনিক কবিতার এমন বহু নিদর্শন ও নজির আমার কাছে আছে—যা কবির আত্মা থেকে উৎসারিত নয়, স্বতঃস্ফূর্তির পথ বেয়ে প্রাণ থেকে উদ্ভূত নয়, যা কেবল বাইরে থেকে আরোপিত এবং বুদ্ধির আঁচে উত্তাপিত। অর্থাৎ যা অর্গানিক নয়, মেকানিকাল।

কিন্তু এই-জাতীয় কবিতার পক্ষেও কিছু কথা আছে। বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা কি সে কথাটা একবার স্মরণ করা যাক। দেশের সর্বত্রই অর্থনৈতিক সংকট, দু বেলা দু মুঠো অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা নেই শতকরা পঁচিশ ভাগ লোকের; এরই পাশে আর-এক সম্প্রদায় রয়েছে, যেখানকার অর্থনৈতিক জৌলুস নির্বিত্ত মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এই অর্থনৈতিক অসাম্য মানুষকে অসন্তুষ্ট করে তুলবেই, আর অসন্তুষ্ট চিত্ত কখনোই প্রাচীন সৌন্দর্যবাদে এবং নন্দনতত্ত্বে আস্থাশীল ও সশ্রদ্ধ হতে পারে না। ফলে কাব্যে আঙ্গিক যেমন রুক্ষ হয়ে ওঠে, বক্তব্য তেমনই হয় ধারালো আর ঝাঁঝালো।

এ ছাড়া চাঁদ ফুল পাখির উপস্থাপনে কাব্যসৌন্দর্য এতরকমে এতভাবে ও এতবার গাঁথা হয়েছে যে, এখন এই-সকল উপকরণের মাধ্যমে সৌন্দর্যসৃষ্টির ধার ও মান কমে গেছে। তাই কবিকে নতুন উপকরণের সন্ধানে বের হতে হয়েছে।

আধুনিক কবিতার ছন্দ সম্পর্কেও কঠোর সমালোচকেরা যে নিন্দা করতে বিরত হবেন—এমন মনে হয় না। তাঁদের বলতে শুনেছি—আজকের কবিরা বিগত কালের, এমনকি এই সেদিনের, বিশেষ করে কালি-কলম-কল্লোল-যুগের কবিদের মতো, মিল দিতে পারে না। এঁদের মাত্রাজ্ঞান, তাল লয় সম্পর্কে ধারণাও, দীন। অথচ এঁরা বুদ্ধিধর, তাই ছন্দপ্রকরণের সৌকর্য স্বীকার না করে কাব্যপ্রযুক্তিকে গদ্যধর্মী করে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন।

আজকের কবিতার কায়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গদ্যকর্মের ছাঁচে গড়ে তোলা হয়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য, এবং গদ্যকর্মের মতই অনেকটা শব্দালংকারবিহীন। কিন্তু এর দ্বারা

কবির ছন্দ-নির্মাণের দুর্বলতা সূচিত হয় না। গদ্যরচনার ধর্মকে স্বীকার করে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্রয় করেই আজকালকার কাব্যের চালচলন; কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাসের অভাব বড় একটা চোখে পড়ে না, বরং পূর্বসূরী কবিদের দ্বারা যে-সকল মিল অব্যবহৃত ছিল, অথচ ঠিকুজি-কোষ্ঠীতে যারা একান্তভাবে কুলীন, সেই-সব মিলই আজকের কাব্যে হামেশা ব্যবহৃত হচ্ছে। মিল নেই, অথচ শুধুই গদ্য বা গদ্যের ছাঁচকে গ্রথিত করা হয়েছে অসম পয়ারের মূর্তিতে—এমন কাণ্ড কিন্তু খুব ব্যাপক নয় আধুনিক কাব্যের রাজত্বে। অবশ্য এ জিনিস যে হচ্ছে না তা নয়, তবে তাকে মোটা অঙ্কের এক ব্যতিক্রম বলেই বর্ণনা করতে হবে। আগেই বলেছি, কাব্যরীতি, কাব্যের ঢঙটি, নিঃসন্দেহে গদ্যের, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা বা বাচ্যাতিরিক্ত ফলশ্রুতি একান্তভাবে কাব্যেরই। শুধু তাতে ছন্দের দোলারই অভাবটা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয়।

বাংলা ভাষার কাব্যনির্মাণের প্রধান বাহক হল পয়ার ছন্দ। এমন-কি আমরা যে গদ্য বলি—তাও যেন জোড়সংখ্যার যতিযুক্ত ভাষা। তাই খুব বেশী রকমের ছন্দোবৈচিত্র্য না থাকলে বা অন্ত্যানুপ্রাসে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সাহায্য গ্রহণ না করলে ছন্দের আঘাত ও আবর্তন সম্পর্কে আমাদের কান রায়দান করতে কুণ্ঠাবোধ করে—ফলে মনে হয়, বুঝিবা গদ্যেই সবটা বলা হল।

একটা কথা বলা বোধ হয় এখানে অসংগত হবে না। নিজে কবি হিসেবেও বটে বা আধুনিক কবিতার সশ্রদ্ধ পাঠক হিসেবেও বটে—একটা কথা নিবেদন করি। কবিতা লেখা মনের এক বিশেষ আবেগ ও উপলব্ধির অনিবার্য অপ্রতিরোধ্য ফসল। এক-এক সময় এক-একটি অনুভব মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, তখন ঐ উপলব্ধির কাব্যরূপ দান না করে তার নিস্তার নেই। এই আবেগটির রূপকরণে বাহনটি বড় কথা নয়। যিনি কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই ছন্দ মেলাতে পারেন—এবং ছন্দ মেলানো ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ। বর্তমান বাংলায় এমন কোনো কবি নেই, যিনি মিলের কবিতা, ছন্দপ্রধান কবিতা আদৌ লেখেন নি। কাজেই মিল দেওয়ার অক্ষমতা বা ছন্দ-জ্ঞানের অক্ষমতার অভিযোগ তাই যাঁরা করেন তাঁরা বোধ হয় রসিকতা করেই বলেন—আসলে এটি তাঁদের কোন রকম দোষারোপই নয়।

তবে গদ্যধর্মী ছন্দকে বাহন করেন কেন কবিরা? এটা তো আর অস্বীকার করা যায় না যে, আজকের বেশীর ভাগ কবিরাই সত্যিই গদ্যছন্দে কাব্য রচনা করছেন। এর কারণ আমার মনে হয় এই যে, বর্তমান যুগে কবি পাঠক সবাই যতটা বেশী মননশীল হয়ে উঠেছেন, ততটা কিন্তু আবেগপ্রবণ নন। অর্থাৎ আজ কবি ও পাঠক যতটা

রিজ্‌নাল, ততটা সেন্টিমেণ্টাল নন। সেন্টিমেণ্টের সঙ্গে ছন্দের দোলার একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে, অথচ রিজ্‌নের সঙ্গে ছন্দের এই দুলুনির কোনো যোগ নেই। তাই মননধর্মী কবিতাকে গদ্যের কোল ঘেঁষে স্থান করে নিতে হয়েছে। এর দ্বারা কবির কোনোরকম অক্ষমতা বা দুর্বলতা সূচিত হয় না।

সবশেষে উপসংহারে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, পাঠক বা সমালোচক, সমর্থক বা নিন্দক, যিনিই হোন্ না কেন—আধুনিক কাব্যপাঠের পূর্বে আধুনিক যুগের সামগ্রিক চেহারা ও চেতনা সম্পর্কে একটি খতিয়ান যেন তিনি করে নেন। তা হলে কবিমানসকে চেনা সহজ হবে। কবিরা এই সমাজেরই মানুষ, সমাজবহির্ভূত বায়ুভুক্ কোন কল্পনা-লোকের বাসিন্দা নন। চালের দাম বাড়লে তাঁদেরও রান্নাঘরে রোজ উনুন জ্বলে না। এই সমাজব্যবস্থার সমস্ত তরঙ্গ তাঁদের চেতনা-তটে আছড়ে পড়ে। জীবনের ভরণ-পোষণে নিশ্চিন্ত প্রাচীন কবিদের মত তাঁদের জগতে সদাসর্বদা গোলাপী চেতনার ফুল দল মেলে নেই।

তাই বলে যেগুলি অ-কবিতা, বা সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে অথবা রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কারণে প্রয়োজনীয় সেই কাব্যকল্প-রচনাকে উৎকৃষ্ট কাব্যের মর্যাদা দিয়ে শ্রদ্ধা করে বরণ করতে বলছি না। ঐকতানবাদনে যেমন বেহালা, ফ্লুট, তব্‌লা, তানপুরা থাকে, তেমনি করতাল প্রভৃতির স্থানও অনিবার্য। তাই বলে মার্গ সুর-মূর্ছনা সৃষ্টি করতালবাদ্যের কর্ম নয়। আমড়ার কাছে কেউ যেমন আপেলের গুণপনার আশা রাখে না, তেমনি এই সাময়িক কাব্যকে চিরন্তন ভাণ্ডারে তুলে রাখার যোগ্য যথার্থ আধুনিক কাব্য বলে কেউ ভুল করবেন না।

আর একটি অনুরোধ। আধুনিক কবিরা যেমন সহজবোধ্য হচ্ছেন, নিজেদের মন ও মননকে পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরছেন, অতি উৎকট দুরূহশব্দশিল্পী দুর্বোধ্য কবিও যেমন সাধারণ্যের দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছেন—তেমনি পাঠক সম্প্রদায়ও শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নিয়ে আধুনিক কবিতা বুঝুন, এই দাবি করা বোধ হয় অসংগত হবে না—অন্ততঃ আজকের তিরিশের কোঠার কবিদের পক্ষ থেকে।

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু
প্রাক্তন ছাত্র

জীবনানন্দ দাশ -প্রসঙ্গে

'পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে যদি এক নতুন জলের কল্পনা করা যায়, কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে এক নতুন প্রদীপের কল্পনা করা যায়—তা হলে পৃথিবীর এই দিন, রাত্রি, মানুষ ও তার আকাঙ্ক্ষা এবং সৃষ্টির সমস্ত ধুলো, সমস্ত কঙ্কাল ও সমস্ত সংস্কৃতিকে ছেড়ে দিয়ে এক নতুন ব্যবহারের কল্পনা করা যেতে পারে, যা কাব্য, অথচ জীবনের সঙ্গে যার গোপনীয় সুড়ঙ্গ-লালিত সম্বন্ধ।"

জীবনানন্দ দাশের এই উক্তি তার আত্মকাব্যরীতির প্রতিই প্রযোজ্য বললে বোধ হয় অন্যায় বলা হয় না। তাঁর কাব্যের প্রতিটি স্বতন্ত্রতা, প্রতিটি প্রসাদগুণ নিয়ে পৃথক বহু প্রবন্ধ রচনা করা চলে, কিন্তু আলোচ্য রচনার সংক্ষিপ্ততায় তাদের বিস্তৃত স্থান মেলা কঠিন। অনেকে শুনি বলেন—অনেকে কেন, প্রায় সকলেই—যে, তিনি নির্জন কবি; এই আখ্যা কবি স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নেন নি—বলেছেন আংশিক সত্য। তাঁর সংসার-বিমুখতাও আংশিক সত্য—শেষ জীবনের লেখাগুলি দেখি সমাজচিন্তায় ভাবিত এবং, আরও পরে তাঁর সর্বশেষ লেখাগুলি সেই আর্ষ দার্শনিকদের রচনার মত আশ্বাসপ্রদায়িনী—প্রজ্ঞা ও প্রেমের সংমিশ্রণে আশ্চর্য অনুভূতিময়।

এস্কেপিস্ট কবি যখন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ান তখন তাঁর সঙ্গে বাস্তবের দৃষ্টিবিনিময় এক গভীর ছাপ রাখে তাঁর কাব্যকৃতির উপর। অচেনা পৃথিবী, যেখানে 'স্পন্দন সংঘর্ষ গতি, যেখানে উত্তম চিন্তা কাজ' তাঁর কাছে—'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে লালিত আত্মার কাছে—শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বরের' মত ভয়াবহ মনে হয়। তবু এখানেই কবির আত্ম-অবলুপ্তি নয়, এখানেই ফুরিয়ে-যাওয়া নয়—এরও পরে এমন এক মুখ আছে যার দিকে তাকালে 'পৃথিবীর সমুদ্রের নীল' অনুভব করা যায়—যার মুখে 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য'।

প্রতিটি ইন্দ্রিয় মেলে কবি যা দেখেছেন—মহান্ বোধ দিয়ে যা অনুভব করেছেন, তাই কাব্যে স্থান পেয়েছে। তখন কবি প্রচলিত রীতি, প্রচলিত শব্দ-ব্যবহার সমস্ত অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন। বাংলা কবিতায় যখন এমন একটা লাইন দেখা গেল:

আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—শুয়ে আছে নদীর এ পারে—
বিয়োবার দেরি নেই, রূপ ঝরে পড়ে তার

তখন তৎকালীন শিক্ষিত মহল বিস্মিত হলেন, সহজে স্বীকার করতে চাইলেন না কবিপ্রতিভাকে। এমন তো প্রায় প্রত্যেক সার্থক রচয়িতার জীবনে ঘটেছে—স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র। জীবনানন্দ এই ঔদাস্য সহজভাবে নিলেন এবং সমগ্র জীবন কেন্দ্রীভূত

করলেন কাব্যসাধনায়। একটি প্রবন্ধে তিনি কবির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনোরম ভাষায় বলেছেন যে, কবিকে প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর যেতে হবে, শহরে বন্দরে জনতার স্রোতে ঘুরতে হবে, আর সবার চেয়ে বড় কথা, নিজের প্রতিভার কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

নিজের সমগ্র সত্তাকে তিনি প্রতিভার কাছে বিশ্বস্ত রেখেছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না।

কিছুদিন আগে এক বিলেতী কাগজে চার্লস্ ডিকেন্সের একটি ছবি দেখছিলুম—ঔপন্যাসিক ঘরে একটি চেয়ারে চিন্তাভারাক্রান্ত হয়ে বসে আছেন, আর তাঁর চতুর্দিকে উপন্যাসসৃষ্ট পাত্র পাত্রী সকলে ভিড় করে আছে। জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে ঠিক সেই ছবিটির কথা মনে হল। ধ্যানী কবি তাঁর সৃষ্টির কেন্দ্রে স্থির হয়ে বসে আছেন, আর তাঁকে ঘিরে আছে অসংখ্য দৃশ্যপট, অসংখ্য ভাবকল্পনা, অসংখ্য বিস্ময়—যাদের আমরা সকলেই দেখে থাকি অথচ বিস্মিত হই নে। জীবনানন্দের কাব্যে তাদের সহজ প্রাপ্তি আমাদের মুগ্ধ করে।

এই মুগ্ধতার প্রসাদ কবির লিপিকুশলতার উপর ভর করে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—বহুক্ষণ জড়িয়ে থাকে মনকে এক মদির সুগন্ধের মত। এটুকুই জীবনানন্দের কবিতার সব নয়—এর পর কবির চিন্তা বিস্তৃত হল ইতিহাস নীতি ও কালের উপর। কাউকেই অগ্রাহ্য করতে পারেন না কাব্যস্রষ্টা—তাই বলে ইতিহাস মানে ভ্রান্তি নয় বা কাল-অর্থে কাল-ভীত আত্মসমর্পণ নয়। তা হলে ধ্যানী কবির পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হতেন। এদের পারম্পর্য মথিত করে, এদের চেয়ে উর্ধ্বে জ্বলে উঠল আশ্বাস :

সুচেতনা, এই পথে আলো জেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে—সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ···

[গত দুর্গোৎসবের কিছুদিন পর কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর অভ্যাসমত একাকী বেড়িয়ে ফিরছিলেন রাসবিহারী এভিন্যু ধরে—অকস্মাৎ এক ট্রাম এসে তাঁকে গুরুতর আঘাত করে। সমবেত জনতা তখনি তাঁকে ট্যাক্সি করে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রায় এক সপ্তাহ তাঁকে প্রবল যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়—কখনও সজ্ঞানে, কখনও অজ্ঞানে। অবশেষে উৎকণ্ঠিত প্রিয়জন ও গুণমুগ্ধদের আশা ব্যর্থ করে ২২শে অক্টোবর রাত্রি সাড়ে এগারোটায় তাঁর মৃত্যু হয়]

উৎপল বসু
তৃতীয় বর্ষ। বিজ্ঞান

আধুনিক কবি ও কাব্য

শস্যশ্যামলা নদীমেখলা বঙ্গভূমি—কাব্যলক্ষ্মীর প্রভাব এখানে শতধারায় প্রবাহিত। এখানে অগণিত নরনারীর মুখে মুখে গান, ছড়া। যদিও কখনও সুরে কখনও আবার বেসুরে এই-সমস্ত কাব্যের উন্মেষ হয়, কিন্তু তবু তার একটা প্রাণ আছে! বাংলা কাব্য তাই বিশ্বের যে কোন দেশেরই সমান মর্যাদার দাবি রাখে।

বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রচারক রবীন্দ্রনাথ। যদিও মধুসূদনের সাহিত্যকৃতি ভাব, ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী, রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর হতেই বাংলা কাব্যের একতারা সপ্তস্বরায় রূপান্তরিত হল। তাঁর মত এত বড় বাণীমন্ত্রের সাধক পূর্বে কেহই আবির্ভূত হন নি।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের উন্মেষ সাহিত্যাকাশে। এই অনন্য রূপকার শুধুমাত্র ব্যক্তি-কবি নহেন. তিনি সমগ্র বাংলা কাব্যের একটি পরিপূর্ণ যুগ—সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। তাঁর সমকালে তাঁর সমসাময়িক কবিদের নাম তত বেশী ছিল না, তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা সুযোগ পেয়েছিল অবাধ অগ্রগতির। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবেশ রবীন্দ্রকাব্যের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। তাঁর এই প্রাকৃতিক চেতনা শুধু কাব্যরচনায় প্রয়াসী করে নি, অধিকন্তু এক নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ আনন্দের কবি—আনন্দময় এই পৃথিবীর মাধ্যমেই জগৎস্রষ্টার পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা অবলীলাক্রমে অতীত ও বর্তমান কালে বিচরণশীল। রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়াতীত ভালবাসায় বিশ্বাসী। দেশের প্রতি অনুরাগ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় দেখা যায়। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী-শৃঙ্খলমুক্তি-সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী দেশপ্রেমিকরা দিকে দিকে আত্মাহুতি দিতে লাগলেন অসংগঠিত অসমসাহসিকতার অগ্নিকুণ্ডে। জাতীয় চেতনার উন্মেষক তাঁর এই সময়ের কাব্য। জাতির এক দুর্যোগময় মুহূর্তে শান্তির কবি, আনন্দের কবি, দুঃখকে বরণ করে নিয়েছিলেন। কবি তাই বারে বারে আবাহন জানিয়েছেন দেশবাসীকে—স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত হতে। জাতির এই দুর্দিনে তাই কবির সতর্কবাণী :

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

১৯০৫ খৃস্টাব্দই রবীন্দ্রকাব্যরসের প্রথম পর্ব। এই পর্বে বহু কবির আবির্ভাব হয় বাংলা-কাব্যাকাশে। এই-সমস্ত কবিদের কাব্য প্রধানতঃ রবীন্দ্র-প্রতিভারই ছায়া-অবলম্বনে রচিত। এই পর্বের কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে একমাত্র সত্যেন্দ্রনাথ, যদিও রবীন্দ্র-যুগের কবি, কিন্তু তবুও তাঁর কাব্যাবলী রবীন্দ্র-প্রতিভাকেও অতিক্রম করে। এমনই এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্তে কবির জীবনে এল ছেদ, কবি হারালেন তাঁর কাব্য, কিন্তু কাব্যরস চিরজাগরূক রইল কাব্যজগতে। তিনি গেয়েছিলেন মহাসাম্যের জয়গান। শ্রমিক কিষাণ মধ্যবিত্ত জীবনের যে দারুণ অবস্থা, তাদের অভাব অভিযোগ সবই ধরা পড়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়।

যতীন্দ্রমোহন যদিও রবীন্দ্র-প্রদর্শিত কাব্যপথের পথিক হয়েছিলেন কিন্তু তবুও তাঁর কবিতার মধ্যে নিজস্ব একটা সুর ধ্বনিত হত। অতিশয় সামান্য বাঙালী জীবনের সুখদুঃখ, এবং বাংলা পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় যেমন মধুর তেমনই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এই বাস্তবপ্রীতির সঙ্গে কবিকল্পনার সৌকুমার্যও তাঁর কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কুমুদরঞ্জন প্রধানতঃ সৌন্দর্যপিপাসু। শস্যশ্যামলা বাংলা দেশের শিল্পশ্রী তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে। কালিদাস রায়ের কবিতার দুটো রূপ। একটার আদর্শ সংস্কৃত। তার ভাব ভাষা অতীত ভারতের কীর্তি ও জয়গাথাতেই সমুজ্জ্বল। অপরটিতে পল্লীপ্রকৃতির শ্যামলিমার অপূর্ব সমারোহ।

যতীন্দ্রমোহনের কবিকর্মের সূত্রপাত ১৯১০ খৃস্টাব্দে। এ যুগের মানুষের আত্মিক আকুতির এমন সার্থক সুন্দর কাব্যায়ন বিরলদৃষ্ট। তাঁর কাব্যপরিক্রমায় অভিমান-আক্ষেপ, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ, অশান্তি-শ্লেষই প্রধান। যতীন্দ্রমোহনের কাব্য একদিকে যেমন আমাদের আশ্বস্ত করে অপরদিকে তেমনই শান্তির খোরাক যোগায়।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বে যে-সমস্ত কবিদের আবির্ভাব তাদের মধ্যে মোহিতলাল, নরেন্দ্র দেব, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মোহিতলালের ভোগাত্মবাদী পৌরুষমণ্ডিত দার্শনিক কবিতাগুলি বাঙালী কাব্যরসপিপাসু পাঠকমহলে বিস্ময়-সৃষ্টি করেছিল। নরেন্দ্র দেব যে-সমস্ত কবিতা লিখেছিলেন তা সবই তাঁর প্রেয়সীর উদ্দেশে, তাই তাঁর তৎকালীন কাব্য জনসাধারণের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করে নি। সাবিত্রীপ্রসন্নের কবিতাবলীর মধ্যে পাই তাঁর পল্লীশ্রী-উপলব্ধি, তা ছাড়া দেশপ্রেমাত্মক কবিতাও তাঁর কাব্যের একটি দিক ছিল। তাঁর কবিতাগুলি খুব বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি।

দেশপ্রেমাত্মক কবিতাবলী লেখার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেন। রবীন্দ্র-যুগের দ্বিতীয় পর্বে যাঁর কাব্য সকলকে আশা-ভরসা জুগিয়েছিল তিনি হলেন কাজী নজরুল। কবিগুরুর কাব্যে যখন চিরযৌবনের জয়পতাকা উড়ছে, সবুজের অধিকারের জন্য যখন তিনি শিকল-ভাঙার কল্পনা করছিলেন, তখনই নজরুলের উন্মেষ। রবীন্দ্রনাথের সবুজের জয়গান তাঁকে বিদ্রোহী করেছিল। তাই তিনি অকস্মাৎ একদিন 'ঝড়ের মতন বিজয়কেতন নেড়ে, অট্টহাস্যে আকাশখানি ফেড়ে' বাংলা কাব্যসাহিত্যে বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। কাব্যের মাধ্যমে অত্যাচারে-জর্জরিত মূক মানুষদের বেদনাময় হৃদয়কে তিনি প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছিলেন। সেদিনের রাজরোষ কবির উন্নত শিরকে অবনত করতে পারে নি। নজরুল জেনেছিলেন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুক্তি ও অগ্রগতির মূলে চাই সর্বহারাদের সমাজগঠন।

'টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে, মা, গলহার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার ধূমকেতু-জ্বালা উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।'

কবি জানতেন এ সত্যটি—'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নাই কিছু মহীয়ান'। তাই তিনি প্রাণমনে চেষ্টা করেছিলেন মানুষের জয়গান করতে—মানুষের সুখ-দুঃখ মান-অপমানের কথা তিনি তাঁর কাব্যের মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন।

রবীন্দ্র-যুগের তৃতীয় পর্বের কবিদের পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এঁরা সকলেই তৎকালীন যুগে বেশ একটা নাম করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কাব্যের নীতি-আদর্শ পরস্পর-বিরোধী ছিল। প্রথম দলের কবিদের মধ্যে সজনীকান্ত দাস, বনফুল, প্রমথ বিশী, জগদীশ ভট্টাচার্য। এই-সমস্ত কবিরা প্রথম দিকে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন সত্য, কিন্তু বাংলা কাব্যের উন্নতিবিধানে এঁদের দান খুব বেশী নয়। এঁরা সকলেই প্রগতি-সাহিত্যের বিস্তৃতি সহ্য করতে না পেরে রবীন্দ্রনাথ থেকে বহু কবিকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিয়েছেন।

দ্বিতীয় দলের কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত প্রভৃতি প্রধান। এঁরা অবশ্য খারাপ-ভালোর মাঝামাঝি স্থানে বিচরণ করতেন। 'কল্লোল' 'কালি কলম' 'প্রগতি'র যুগ এটাকে বলা যায়। এই তিনটি মাসিক পত্র আমাদের সাহিত্যে একটা নূতন ভাবধারা, একটি অভিনব বাচন-ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

তৃতীয় দলের মধ্যে হেমচন্দ্র বাগচী, অন্নদাশংকর রায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়,

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সুশীলকুমার ঘোষ। এঁদের কাব্যের প্রধান সুর 'Art for Art's Sake'—শিল্পের জন্য শিল্প। এই দলটির মধ্যে অন্নদাশংকরই কেবল রবীন্দ্র-প্রভাব এড়িয়ে এক নতুন কাব্যপ্রবাহের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। পল্লী-বাংলার ঐতিহ্য অনুসরণ করে এঁরা কিছু কিছু পল্লীকাব্য ও ছড়া সৃষ্টি করে আধুনিক কাব্যশ্রী বাড়িয়েছেন।

চতুর্থ দলের নায়ক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এই দলে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, অন্নদাশংকর রায় প্রকৃতি কবিরা যোগদান করেছিলেন। মধুসূদনের কাব্যের গঠন-পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে তিনি এক নতুন শ্রেণীর কাব্যরচনায় প্রয়াসী হলেন। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের আর একটা কথা, তিনি সাবলীল ভাষার কবি হয়েও অযথা তাঁর কাব্যকে গাঢ় ও কঠিন ভাষার সাহায্যে তৈরী করে সাধারণ মানুষের কাছে অবোধগম্য করে তুলেছিলেন। বিষ্ণু দের কবিতাগুলি কতকটা খাপ-খোলা তলোয়ারের মত শানিত। তাঁর কাব্যেও কিছুটা দুর্বোধ্যতা ছিল। অমিয় চক্রবর্তী কিছু উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছিলেন, কিন্তু তবু তাঁর কবিতাবলীর মধ্যে দুর্বোধ্যতার রেশ আছে।

পঞ্চম দলের কবিদের মধ্যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, গোলাম কুদ্দুস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হাসিরাশি দেবী, বাণী রায়, বিমল মিত্র। এই-সমস্ত কবিদের মধ্যে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাণী রায়ের কবিতাগুলোও কিছুটা সমাদর লাভ করেছিল। বিমলচন্দ্রের কবিতা রসিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এর পরেই সত্যকার প্রগতি-সাহিত্যের যুগ। এই যুগের কবিদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

এখন থেকে গদ্য কবিতা রচনাতে প্রতিটি কবিই অগ্রসর হলেন। পদাতিকের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর কাছ থেকে সুভাষবাবু যে সম্মান পেয়েছিলেন তাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নূতন ভাবে কাব্য রচনা করতে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতাগুলোও বেশ কাব্যমর্যাদার দাবি রাখে।

এই-সব প্রগতিশীল কবিদলের সময়ে আর একদল কবির আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের আদর্শের কোন মিল ছিল না। এঁদের মধ্যে দিনেশ দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও গোপাল ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের কাব্য এখনও সমভাবে আনন্দ দিচ্ছে পাঠকদের।

রবীন্দ্রনাথের যুগে একদল শক্তিশালী প্রগতিশীল কবির আবির্ভাব হয়। এঁদের মধ্যে সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

এইখানেই মোটামুটি আধুনিক কবি ও কাব্যের আলোচনা শেষ হল। অবশ্য অনেক কবির নাম করা হল না; যেমন—সুকুমার রায়, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী। কারণ তাঁরা শিশুসাহিত্য নিয়েই বেশী আলোচনা করেছেন, তাই তাঁদের কাব্যালোচনা এ পর্যায়ে আনা হয় নি।

শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য
প্রথম বর্ষ। সাহিত্য

চর্যাপদ

পূর্বে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করা হত কৃত্তিবাসের রামায়ণ দিয়ে। কারণ, কৃত্তিবাসের রামায়ণের পূর্ববর্তী লিখিত কোন বাংলা-সাহিত্যের উপাদান আমাদের হাতে ছিল না। নানা রকম সম্ভব অসম্ভব মতবাদ দিয়ে কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী যুগকে ব্যাখ্যা করা হত। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯০৭ খৃস্টাব্দে নেপাল থেকে একখানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে আনেন। নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়', যার বর্তমান পরিচিত নাম 'চর্যাপদ'। পুঁথিটির পরিচয় হিসেবে 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' ব'লে শাস্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিতদের গবেষণা আরও প্রমাণ করেছে যে, এই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম লিখিত নিদর্শন, এবং এর অন্তর্গত পদগুলির রচনা হয় প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে। বর্তমানে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস 'চর্যাপদ' দিয়ে শুরু করা হয়।

ভূমিকা

আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ—বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি—মধ্য-ভারতীয় আর্য-ভাষার (Middle Indo-Aryan) শেষস্তর অর্বাচীন অপভ্রংশ অথবা 'অবহট্‌ঠ'-এর মৌলিক রূপান্তরের ভেতর দিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই পরিবর্তন ঘটে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। এই কয়েক শতকের মধ্যেই বাংলা ভাষা একটি সুস্পষ্ট ভিন্নতর ভাষার আকার ধারণ করে—এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিযুগ বলতে এই কালকেই (৯৫০-১৩০০ খৃঃ) বোঝায়। এই যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' বা 'চর্যাপদ'। মূল পুঁথিখানি অবশ্য সেই যুগের নয়। মূল পুঁথিখানি একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। পুঁথিখানির লিপি-চাতুর্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে জানা যায়, এই সংগ্রহ-গ্রন্থখানি চতুর্দশ শতকে গ্রথিত। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে ৫০খানি চর্যা ছিল—চর্যাগুলির ভাষা, ব্যাকরণ-রীতি ইত্যাদি বিচার করে দেখা যায়, এদের রচনা-কাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। কিন্তু ৫০খানি চর্যার মধ্যে মাত্র "৪৭টি চর্যা পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে অবশ্য একটি খণ্ডিত। তিব্বতী অনুবাদ দেখে মনে হয় এ ছাড়াও আরও চর্যা ছিল, কিন্তু তা হারিয়ে গিয়েছে।"

চর্যাগুলো যে গান করবার জন্য ব্যবহৃত হত, তাদের সাধারণ রূপ দেখলেই আমরা সহজে বুঝতে পারি। প্রত্যেকটি চর্যা তালমানযুক্ত গীতি—যাকে আমরা বলি

গীতিকবিতা—প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে এই রকম গীতিকবিতা 'পদ' নামে পরিচিত। "পদসাহিত্য হল গাইবার মত গীতিকবিতা, ভাব ও অনুভূতির কথা"। আর, "চর্যাগীতি বাংলা 'পদে'র বা পদাবলী সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন"। প্রত্যেক চর্যার উপরেই 'রাগে'র যথারীতি উল্লেখ রয়েছে,—যেমন 'রাগ পটমঞ্জরী', 'রাগ গবড়া', 'রাগ ভৈরবী', 'রাগ কামোদ' প্রভৃতি।

নেপাল থেকে আনীত পুঁথিখানির নাম হিসেবে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' কথাটির উল্লেখ দেখা যায়। 'চর্য' অর্থে যা আচরণীয়, এবং 'অচর্য' অর্থে যা আচরণীয় নয়। ধর্মীয় আচার এবং অনাচার সম্বন্ধে বিধিনিষেধকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করা হয়েছে ব'লে এর নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। "বৌদ্ধসহজিয়া ও তান্ত্রিক সাধকদের সাধননার্গ বিশ্লেষণ, ভাব-সম্পদ প্রচার এবং সাংসারিক দুঃখতাপের দহন থেকে মোক্ষলাভের উপায় নির্দেশের গরজ থেকে বৌদ্ধ সাধকগণ চর্যাগীতিমালা রচনা করেছিলেন।"

চর্যার বিষয়বস্তু

বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা অনুসারে চর্যাগুলোকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কতকগুলি চর্যায় উচ্চ দার্শনিক মতবাদ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবরণ ও আলোচনা স্থান পেয়েছে। এই শ্রেণীর পদসংখ্যাই অধিক। কতকগুলিতে সাধন-প্রণালী, যোগ ও তান্ত্রিক মতবাদের বিধিনির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। আর কয়েকটিতে উক্ত দুই শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত সমন্বয় করা হয়েছে—যোগ ও তন্ত্রপ্রক্রিয়ার বিবরণের সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্বালোচনাও স্থান পেয়েছে। তবে চর্যাপদে যা-কিছু বলা হয়েছে সমস্ত কিছু উপমা-রূপক-চিত্রের মাধ্যমে বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষ অর্থের অন্তরালে গভীর অর্থকে প্রকাশ করা হয়েছে, ফলে চর্যাগীতির অর্থসমূহ একটি গূঢ় মিস্টিক আচ্ছাদনে আবিষ্ট হয়ে গেছে, যা গুরুর উপদেশ ও টীকার সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য করা অসম্ভব।

প্রত্যেকটি চর্যায় ভনিতা রয়েছে, তাতে পদকর্তার নাম ও মাঝে মাঝে তাঁর সাধন-প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে' প্রাপ্ত ৪৭টি চর্যা মোট ২৩ জন পদকর্তার রচিত। এঁরা সকলেই সিদ্ধাচার্য—বৌদ্ধ শ্রমণ, বাস করতেন বিভিন্ন স্থানের বিহারে, এবং মাঝে মাঝে সম্ভবত পদকীর্তনের জন্য একত্র সমবেত হতেন। এঁদের এই পদগুলি ছাড়া এঁদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। এঁরা যে বাঙালী ছিলেন সে বিষয়ে তাঁদের রচিত পদগুলির ভাষা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। তবে এঁদের নাম, জীবনধারণপ্রণালী—যার ইঙ্গিত এঁদের পদগুলির মধ্যে রয়েছে—ভাবলোক, ইত্যাদি

সিদ্ধাচার্যগণ

যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে যে "চর্যাগীতিকারগণ অধিকাংশই হয় বর্ণাশ্রমের বাইরে অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ পর্যায়ের লোক, নয়তো বা বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নীচ সামাজিক বর্ণের প্রতিনিধি।" এই সিদ্ধাচার্যগণ বৌদ্ধধর্মের মহাযান-সম্প্রদায়ের বজ্রযান সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত সহজিয়া-পন্থী। 'শূন্যবাদ' এই সহজিয়া-পন্থীদের মতবাদ।

সহজিয়া-মতবাদী সিদ্ধাচার্যগণ বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করতেন। তাঁদের ঈশ্বরে, যাগ-যজ্ঞ-হোম-কর্মে বিশ্বাস ছিল না। ব্রাহ্মণ্যধর্মবোধের প্রতি তাঁদের এই অনাস্থা—শুধু অনাস্থা নয়, বিরূপতাও—চর্যাসমূহের ছত্রে ছত্রে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। ধর্মকায় লাভকেই তাঁরা চরম মনে করতেন। তখন ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যের যুগ। তবু সেই যুগে সিদ্ধাচার্যগণের এই বিপরীত ভাবাদর্শ—শূন্যবাদ ও নাস্তিকতা—অনুসরণ কোন একটি বিচ্ছিন্ন বা অর্বাচীন ঘটনা নয়। এই বিপরীত ভাবাদর্শ পরিপুষ্টির কারণ তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবিন্যস্ত পরিবেশের গভীর মূল থেকে উৎসারিত বহু বেদনা এবং সাধনার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

চর্যাপদের ভাবলোকের সম্পূর্ণ ধারণা নিতে হলে তৎকালীন বাংলার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে চর্যাপদের সম্যক্ বিচার করা প্রয়োজন। কারণ, চর্যার পদসমূহ কেবল ধর্মীয় উপদেশ ও অনুশাসন দিয়ে ভরা থাকলেও, তাদের প্রকাশের জন্য রূপক ও উপমা রূপে ব্যবহার করা হয়েছে সমসাময়িক সমাজের সাধারণ চিত্রসমূহকে এবং এই সমস্ত সামাজিক চিত্রচয়নের ব্যাপারে সিদ্ধাচার্যগণের সবারই ভেতর এক বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। এই বিশেষ প্রবণতাই চর্যাপদের ভাবলোক-গঠনে প্রভূত সাহায্য করেছে। সর্বোপরি এই সিদ্ধাচার্যগণের অনুসৃত ধর্মনীতি তৎকালীন সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বের পরিণত ফল। তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তৎকালীন পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চর্যাপদকে বিচার করলে, আমরা সিদ্ধাচার্যগণের বিশেষ মানসিক প্রবণতা ও তার কারণ এবং তাঁদের ধর্মবোধকে সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধি করতে পারব না।

সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা

চর্যাপদের চর্যাসমূহ রচিত হয়েছে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। এই সময়টা বাংলার এক যুগ-সংক্রান্তির কাল। এই কয়েক শতকের মধ্যে বৌদ্ধ পাল রাষ্ট্রের পতন, ভিন্ন প্রদেশীয় বর্মন-সেন রাষ্ট্রের আধিপত্য ও তিরোধান, ফলে হিন্দু আধিপত্যের বিলুপ্তি প্রভৃতি ঘটনা দ্রুতগতিতে ঘটে যায়। খৃস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী থেকে চর্যাগীতির যুগ পর্যন্ত হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও সমাজ-আদর্শের বিস্তার এবং আধিপত্যের

যুগ। বাংলাদেশে প্রথম থেকে আর্যসভ্যতা ও তার বিশেষ সমাজবোধ আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আর্যসভ্যতা ও সমাজচিন্তার সঙ্গে বাংলার আর্যপূর্ব সংস্কৃতি এবং সমাজবোধের বহুদিন ধরে বিরোধ চলে—বহু শতাব্দী ধরে দুই সংস্কৃতি পাশাপাশি থাকার ফলে বহু সামাজিক যোগবিয়োগ ঘটে যায়, অবশেষে সবল রাজশক্তি-প্রভাব-বিশিষ্ট আর্যসংস্কৃতি ও চিন্তাধারার কাছে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও সমাজবোধের ক্রম-পরাভব ঘটে। এইরূপে বাংলার আর্যীকরণ চর্যাগীতির যুগের পূর্বেই সমাধা হয়।

বৌদ্ধ পাল-চন্দ্র-বংশের আমলে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তার প্রভাব বিস্তারে কোন বাধা পায় নি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের আড়ম্বরপূর্ণ কঠোরতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম সাম্যের বাণী নিয়ে এক বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সাম্যের বোধই বৌদ্ধ পাল-চন্দ্র-রাজাদের উদার মানসিক গঠনের সাহায্য করেছিল, অপর কোন ধর্ম বা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এঁরা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নি। তাঁদের এই উদার মনোবৃত্তির সুযোগ নিয়ে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার বিশেষ সমাজধারণা নিয়ে বাংলাদেশে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। পালরাষ্ট্রের পতনের পর ভিন্ন প্রদেশীয়, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আস্থাশীল বর্মন-সেন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়। ধর্মবিষয়ে এঁদের উদার মনোভাবের যথেষ্ট অভাব ছিল।

সেনরাষ্ট্রের আমলে রাজশক্তি-পরিপুষ্ট হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের চরম আধিপত্যের কাল। এই সময়েই বাংলাদেশে স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়, কঠোর ধর্মীয় আচার-ব্যবহার দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বেঁধে দেওয়া হল। আর, বৃত্তি অনুসারে বর্ণবিভাগও এই সময়ে সুস্পষ্টরূপে প্রয়োগ করা হয় এবং ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠরূপে স্বীকৃত হয়ে সমাজক্ষেত্রে এবং ধর্মবিষয়ে একনায়কত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। স্মৃতিগ্রন্থে ব্রাহ্মণদের জন্য স্বতন্ত্র ও সহজসাধ্য বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হল। এইভাবে ধর্মজীবনে ও কর্মজীবনে এক চরম অসাম্যের সৃষ্টি করা হল।

খৃস্টীয় অষ্টম শতক থেকে বাংলাদেশ প্রধানত কৃষি ও কুটিরশিল্প -নির্ভর। কৃষি ও কুটিরশিল্প ছিল সেইকালে অন্ত্যজ অথবা ম্লেচ্ছপর্যায়ের অধিবাসীদের বৃত্তি। সেই ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের যুগে শ্রম ও শ্রমসাধ্য পেশা ছিল অতি নিন্দনীয়, শ্রমসাধ্য বৃত্তি যারা গ্রহণ করেছিল তারাও অত্যন্ত হেয় ছিল—যদিও সমস্ত সমাজ তাদের শ্রমের মুখাপেক্ষী ছিল। তৎকালীন সমাজের এই শ্রমবিমুখতা বাংলার জাতীয় জীবনে এক সুদূরপ্রসারী ক্ষতের সৃষ্টি করে দেয়, যার দুঃসহ প্রতিক্রিয়া আজও বাংলার ক্ষয়িষ্ণু সমাজ সারা দেহে বহন করে চলেছে।

সেই ব্যাপক আর্যীকরণের যুগেও বাংলার সমগ্র জনসমষ্টি হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সমাজ-

বিন্যাসের অন্তর্গত হয় নি। তারা ব্রাহ্মণদের ছক-কাটা সমাজের বাইরে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষ, তারা ছিল ব্রাত্য। এদের মধ্যে বর্তমান ছিল ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ-বিরোধী 'লোকায়ত' ভাবধারা, যেমন সহজিয়া মতবাদ, আর এরাই ছিল অতি প্রয়োজনীয় সমাজ-শ্রমিক। প্রবলশক্তিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ্য-সমাজ-পতিদের কাছে এরা চিরকাল মার খেয়েছে, এদের উপর ধর্মের নামে বহু অনাচার ও অত্যাচার করা হয়েছে। মানবজীবনের যে কোন মূল্য আছে এদের তৎকালীন ব্রাহ্মণ-নির্দেশিত জীবনযাপন-পদ্ধতি দেখলে সে কথা ভুলে যেতে হয়।

এইভাবে বাংলার সমাজে সুস্পষ্ট শ্রেণীভেদের সূচনা হল। শ্রেষ্ঠ শ্রেণী বলে স্বীকৃত হল ব্রাহ্মণ বর্ণ, তাদের জন্য স্বতন্ত্র ও সহজসাধ্য স্মৃতি ব্যবস্থা। এই শ্রেষ্ঠতার সুযোগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা দিল যথেচ্ছাচার। একদিকে যাগযজ্ঞ, নানা ক্রিয়ানুষ্ঠানের বাহাড়ম্বর, অপরদিকে যথেচ্ছাচার, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, রুচিবিগর্হিত ক্রিয়াকলাপ—এই হল তৎকালীন ব্রাহ্মণদের প্রকৃত চিত্র। এই-সবের অন্তরালে আর একটি বিশেষ চিত্র প্রচ্ছন্ন ছিল, বহু বেদনা এবং সাধনার মধ্য দিয়ে আর একটি জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। সেখানে দৃষ্টি ফেললে দেখা যায়, নিঃসহায় এক আর্তির মত সাধারণ মানুষের অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রা। শৈবালাচ্ছন্ন স্রোতের মত রুদ্ধ, তাদের জীবনধারণের মান নিম্নতম, বহু শ্রম ও লাঞ্ছনার বিনিময়ে অর্জিত, তাদের জীবনের কোন স্বীকৃতি নেই উপরওয়ালাদের কাছে যারা এই অস্পৃশ্যদের অর্জিত ধনসম্পত্তির ভোগতৃপ্তিতে ব্যস্ত। দরিদ্র নিঃসহায় নিপীড়িত এই জন-সমষ্টি সমাজবিন্যাসের সর্বনিম্নস্তরে থেকে উপরওয়ালাদের নিক্ষিপ্ত বঞ্চনার কালিমাই কি শুধু সেদিন মেখেছিল? ব্যবহারিক জীবনের দুঃসহ অবস্থার অবাঞ্ছিত পীড়ন থেকে এই মানব-গোষ্ঠী মুক্তি চেয়েছে—'লোকায়ত' ধর্মমত ও পথকে আশ্রয় ক'রে তাদের মুক্তিকামনা। "এই বিচিত্র সমাজ, যেখানে একদিকে নিয়মনিষ্ঠা, আচার এবং অন্যদিকে সমাজ-অনুমোদিত অনাচার ব্যভিচার; একদিকে শিল্প, সাহিত্যানুরাগ এবং অপরদিকে সাংস্কৃতিক অধঃপতন; একদিকে সামাজিক উচ্চবর্ণের বিলাস-কলুষিত আড়ম্বর এবং অন্যদিকে দারিদ্র্যের মলিনতা; একদিকে ধর্মাচার এবং অন্যদিকে ধর্মগত উৎপীড়ন ও ভেদবিচার এবং ঐ ভেদবিচার থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আকুতি, মমতা, মৈত্রী ও করুণার জয়গান—এই সামগ্রিক চিত্রই চর্যা-গীতির পটভূমি।"

এই উৎপীড়িত লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠী এমন একটি ভাবাদর্শকে বরণ করে নিতে চেয়েছে যার ভেতর ভেদজ্ঞানের অত্যাচারের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই, যেখানে মানবজীবনের

সুগভীর স্বীকৃতি রয়েছে। সহজিয়া-মতবাদী চর্যাগীতির সিদ্ধাচার্যগণের ভাব-ধারণার ভেতর এই আদর্শকে আমরা সুন্দরভাবে রূপায়িত দেখতে পাই। চর্যাগীতিসমূহের ভাবলোক বিশ্লেষণ করলে আমরা এই মুক্তিপিপাসু জনগোষ্ঠীর মর্মবেদনা উপলব্ধি করতে পারি।

চর্যাগীতিসমূহের সম্যক্ বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমেই বিশেষরূপে প্রতিভাত হয় এক গভীর নিরাশা-বোধ, শূন্যতা-বোধ। কোনদিকে আশা নেই, বঞ্চনা যেন একমাত্র সত্য—এই রকম একটি হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব চর্যার পদসমূহে ওতঃপ্রোতভাবে লেগে রয়েছে। জীবনকে সার্থক ভাবে উপলব্ধি করবার জন্য সেদিনকার সাধারণ মানুষ যেদিকেই ইচ্ছাকে বাড়িয়ে দিয়েছে সেখানেই নির্মম বাধা পেয়েছে অসাম্যের আদর্শে গঠিত বিপুল বিরুদ্ধতার কাছে। তাই একটি সকরুণ হতাশা-মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে সে আপনার মধ্যে ফিরে এসেছে, জেনেছে এই সুকঠোর এবং অপ্রতিরোধ্য সমাজব্যবস্থা অমোঘ "অজ্ঞানভাবে তাদের জীবনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে পারে"। তাই এই প্রবল নিরাশা-বোধ, এই গভীর শূন্যতা-বোধ।

চর্যার ভাবলোক

এই নিরাশা এবং শূন্যতা-বোধ তাঁদের নিয়ে এসেছে চিত্তবৃত্তিরোধের শুষ্ক কঠোরতায়। মনের ও শরীরের কামনা-ইচ্ছাকে তাঁরা নির্মমভাবে দমন করতে চেয়েছেন। কাহ্নুপাদ একটি চর্যায় বলেছেন :

মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তস্থ সাহা।
আসা-বহল পাত ফলবাহা॥
... ...
সুন তরুবর গঅন কুঠার।
ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল॥

মন যেন একটা তরু, পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার শাখা, বাসনা-রূপ বহু পাতা ও ফল সে বহন করছে।...শূন্য-রূপ তরু, গগন-রূপ কুঠার। সেই তরুর ডাল-মূল সব ছেদন কর।

মনের আকাঙ্ক্ষা-কামনাকে সমূলে ছেদন করবার উপদেশ এখানে দেওয়া হয়েছে। লুইপাদের একটি পদে রয়েছে।

এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।

অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়ের বাসনার পারিপাট্যের আশা পরিত্যাগ কর।

জীবনের বিচিত্র উপভোগের বাসনাকে নির্মূলভাবে বিনষ্ট করার এই আকাঙ্ক্ষা কেন

5/3

তাঁদের? "অসহায় মানুষ সমাজের অসীম দুর্দান্ত প্রতাপ ও শক্তিকে দেখেছে, আর দেখে ভয় পেয়েছে, কিন্তু তার রক্তচক্ষুকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিরোধ করার চেতনা তার বিকাশ লাভ করে নি, এই শক্তির কাছে নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অত্যন্ত অক্ষম মনে হয়েছে। এই পরাভব-চেতনা জীবনকে কোন মতে বাইরে প্রসারিত করতে পারে না। সমাজকে, সহানুভূতিহীন সামাজিক পরিবেশকে আঘাত করতে না পেরে সে আঘাত করল নিজেকেই; শক্তিমানের শক্তিকে খর্ব করতে না পেরে সে খর্ব করল নিজেরই শক্তিকে, সমাজকে শাসন না করতে পেরে শাসন করতে চাইল তার শক্তিকে।"

কিন্তু চর্যাগীতিকারগণের কল্পলোক আরো প্রসারিত, যদিও ভুলপথে। তাঁরা এই ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে যোগাসনে বসেছেন কেন? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীতে তাঁরা যে সুখ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, ইন্দ্রিয়-উত্তর লোকে পৌঁছে তাঁরা সেই সুখ আনন্দের আস্বাদন করতে চান। চিত্তনিরোধ ক'রে তাঁরা শূন্যতা-লোকে পৌঁছতে পারবেন, আর সেই শূন্যতা-লোক চির-আনন্দময়। কাহ্নুপাদ তাঁর একটি চর্যায় বলেছেন:

কাহ্ন বিলসঅ আসব মাতা।
সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা॥

চিত্তনিবৃত্তিদ্বারা সহজ-নলিনীবনে প্রবেশ করে কাহ্নুপাদ আসবমত্ত হয়ে বিহার করছেন।

তিনি আর একটি চর্যায় বলেছেন;

চিঅ সহজ শূন সংপুন্না।
কাহ্ন বিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না॥

আমার চিত্ত সহজ-শূন্যতায় পূর্ণ হয়েছে। আমার মৃত্যুতে বিষণ্ণ হোয়ো না।

সর্ববিধ মোহ কামনা বাসনা থেকে মনকে নিবৃত্ত ক'রে নির্বাণের জগতে প্রবেশ করতে হবে। সেই জগতে কোন অসাম্য-ভেদ নেই, এক অখণ্ড আনন্দের জগৎ।

দুঃখময় জগৎ এবং তার থেকে নিষ্কৃতি-রূপ চিত্তরোধ ও আনন্দময় নির্বাণলোক-প্রাপ্তি প্রভৃতি অনুভূতিকে চর্যাগীতিকারগণ নানাবিধ বাস্তব জীবনের চিত্রের সাহায্যে পরিস্ফুট করেছেন। সাধারণ মানুষদের জন্য তাঁরা গান রচনা করেছেন, তাই সাধারণ নিপীড়িত জনগণের দৈনন্দিন জীবনের চিত্রকে তাঁরা রূপক উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নির্বাণলোকের আনন্দকে রূপ দেবার জন্য তাঁরা বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত শবরশবরীদের উদ্দাম যৌন-সম্ভোগের চিত্রকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

এই বাস্তব জীবনের প্রতীক-প্রীতি সিদ্ধাচার্যগণের কল্পলোককে বাস্তবসীমার বহু দূর অবধি টেনে নিয়ে গেছে। মানবজীবন এবং জগৎসংসারের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত-দমনের শুষ্কতা তাঁদের বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে উদাসীন করে তোলে নি। তাঁরা মানুষকে ভালোবেসেছেন, বাস্তব সংসারের একটা পরম স্বীকৃতি তাঁরা তাঁদের ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সংসারই নির্বাণ, সংসারেই সব আছে, মানুষই সব সাধনার শেষ। চাটিলপাদ বলছেন :

নিয়ড়ি বোহি দূর মা জাহী।

অর্থাৎ বোধি নিকটেই রয়েছে, দূরে যেয়ো না।

কাহ্নুপাদের একটি চর্যায় আছে :

নিঅ দেহ করুণা-শূনমে হেরী।

অর্থাৎ নিজদেহে করুণা-শূন্যকে দেখছি।

এর পূর্বে মানুষের মনুষ্যত্ব স্বীকারের ভেতর দিয়ে নির্বাণলোক প্রাপ্তির কোন প্রকার সাধন-প্রণালী ছিল না, তাই ধর্মসাধনাক্ষেত্রে সিদ্ধাচার্যগণের মতবাদ সেই যুগে এক বৈপ্লবিক সূচনা করে, শ্রীচৈতন্যের ভেতর যার পূর্ণপ্রকাশ দেখি। মানব জীবন এবং বাস্তব জগতের স্বীকৃতির ভেতর সিদ্ধাচার্যগণের মানসলোক সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। বঞ্চিত জনগণ জাগতিক সফলতার বিকল্প হিসেবে এই কল্পলোক সৃষ্টি করে নিয়েছে।

চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা ভাষা, পশ্চিমবাংলার তৎকালীন প্রচলিত কথ্যভাষা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের বিশেষ গবেষণা এই তত্ত্বকে তর্কাতীতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভাষা-প্রয়োগ ও ব্যবহার-রীতির বিশেষত্ব অনুসারে চর্যার ভাষা 'সন্ধ্যাভাষা' নামে পরিচিত। শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, "সন্ধ্যা-ভাষার মানে আলো-আঁধারির ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার ; খানিক বুঝা যায় খানিক বুঝা যায় না।" মণীন্দ্র-মোহন বসু মহাশয় বলেছেন, "সন্ধ্যা ভাষা অর্থে বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া যে ভাষার (প্রচ্ছন্ন) অর্থ স্থির করিতে হয়।" এই কারণে চর্যাসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ বোধগম্য করা অত্যন্ত দুরূহ, এবং টীকার সাহায্য ব্যতীত তা প্রায় অসম্ভব। চর্যাপদের একটি সংস্কৃত টীকা আছে, এবং একটি তিব্বতীয় অনুবাদও রয়েছে।

চর্যার প্রকাশরূপ

চর্যাগীতিসমূহের ছন্দ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক বাংলা পয়ার ও ত্রিপদীর এক প্রাচীনতম রূপ। চর্যাতে চতুর্দশপদী কবিতাও পাওয়া যায়, দশম ও পঞ্চাশ -সংখ্যক চর্যা তার নিদর্শন ; এ থেকে অনুমান করা চলে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগেই তার নিজস্ব

চর্যাপদ

চৌদ্দপদী কবিতার প্রচলন ছিল। চর্যাপদের ছন্দ সম্বন্ধে মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় বলেন, "এই গ্রন্থের সকল চর্যাই মিত্রাক্ষর রীতিতে রচিত হইয়াছে। মিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার দুই চরণের অন্ত্যবর্ণে মিল থাকে। চর্যার সর্বত্র এই রীতি রক্ষিত হইয়াছে, আবার সংস্কৃতের জাতি-ছন্দ অনুসরণ না করিয়া আচার্যগণ বৃত্তছন্দেই চর্যাগুলি রচনা করিয়াছেন। ইহাতেই বাংলা ছন্দের মূলভিত্তি গঠিত হইয়াছে, বাংলা কবিতার জাতকর্ম এইরূপে বৌদ্ধাচার্যগণ কর্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছিল।"

শ্রীসুনীল মিশ্র
তৃতীয় বর্ষ। বিজ্ঞান

আধুনিক বাংলা সাহিত্যরচনার ধারা

দীর্ঘ দিনের বাংলা সাহিত্যের সাধনাকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে —একটি প্রাচীন যুগ, যার ব্যাপকতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় হল আধুনিক যুগ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে যার আরম্ভ।

আধুনিক যুগকে মিশ্র সাহিত্য-সাধনার যুগ বলা যায়। পুরাতনের ভিত্তির ওপরেই তার বনিয়াদ গড়ে উঠলেও, নূতন নূতন ভাবধারার নানা আবর্তন বিবর্তন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের আলোড়ন, বর্তমান সাহিত্য-রচনায় সুপরিস্ফুট। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার দুর্গতি ও দুর্নীতির বাস্তব চিত্র যেমন রয়েছে, তার-পাশাপাশি আছে আগামী দিনের ইঙ্গিত, সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। পীড়িত লাঞ্ছিত জাতির গোপন বেদনা ও আর্তি এবং তারই সঙ্গে মনুষ্যত্ব অর্জন করবার পাথেয় রয়েছে বলেই আজকের সাহিত্য গণসাহিত্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বর্তমানে কি উপন্যাস, কি কবিতা, যে কোন রচনারই মোড় ফিরেছে। কল্পনার ফানুসের চেয়ে বাস্তবের তিক্ততার প্রতি সাহিত্য-শিল্পীরা আকৃষ্ট হয়েছেন। বর্তমানের সাহিত্য তাই মাটির স্পর্শ লাভ করেছে, আর সেই মাটির মানুষ হয়েছে তার পাত্র-পাত্রী, তাদের সুখদুঃখ হয়েছে এর উপজীব্য বিষয়বস্তু। আধুনিক সাহিত্যরচনার পরিধি বেড়ে চলেছে, নূতন নূতন পণ্যদ্রব্যে আমাদের সাহিত্য-বিপণি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এর কিছুটা রচনাকারের মৌলিকত্ব, কিছুটা বাইরের আমদানি।

বিভিন্ন রচনারীতির পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে বর্তমান সাহিত্যরচনায়। কবিতার মধ্যে পাই নে লাইন মিলিয়ে চলার প্রচেষ্টা, মিত্রাক্ষরের লৌহবেড়ি; উপন্যাসে দেখা যায় না ভাষা বা অলংকারের সাহায্যে রূপবর্ণনার অহেতুক প্রচেষ্টা। পুরাকালের মত কবিতার বিষয় নয় রাম-রাবণের যুদ্ধ, বেহুলা-বেহুলীর গল্প, রূপকথার রাজপুত্র-রাজকন্যার আসন পাতা নেই সেখানে, দেবদেবীর দ্বারা শাপভ্রষ্ট হয়ে কোনো গন্ধর্ব কিন্নরী প্রচার করে না কোন দেবতার মাহাত্ম্য। কোথায় কোন্ সুদূর হতে আহ্বান এসেছে, এক ঝাঁক সাদা পায়রা আকাশে উড়ছে, চিঠিপত্রের ঝুলি কাঁধে ফেলে ছুটে চলেছে রানার অন্ধকার নিশীথে কোন্ এক গ্রামের উদ্দেশে, এ-সবের দিকে এ কালের কবিরা দৃষ্টি দিয়েছেন। পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি ও পৃথিবী গন্ধময় হয়ে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে realism তারই প্রকাশ ঘটছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে।

এখনকার লেখকেরা উপন্যাসের প্লট বা পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে হানা দেন না ইতিহাসের স্বর্ণময় রাজপ্রাসাদে। মন থেকেই কল্পনা করে নেওয়া লীলাবিলাসিনী, ব্রীড়াবনতা ষোড়শী তরুণীরা পাত্তা পান না একালের উপন্যাসে। রাজকন্যার বদলে স্বীকৃতি পেয়েছে বস্তির কোন এক অন্ধকার ঘরের বিয়োগবিধুরা কোন এক অসহায়া যুবতী বা জীবন-যৌবন সম্বন্ধে আক্ষেপরতা কোন গৃহিণী। বর্তমানের নায়ক হয় কোন শিক্ষিত বেকার যুবক, নয় কারখানার শ্রমিক। সেই পাতার পর পাতা রূপের বর্ণনা, আসন্ন মিলন বা বিচ্ছেদের কথা স্মরণ করে কখনও শিশির-ধোয়া জুঁই ফুলের মত মৃদু হাসি, কখনও শ্রাবণের ঘনবর্ষণ, স্থান পায় নি এই গণসাহিত্যে। ঘর বাঁধবার আগে ভাতকাপড়ের চিন্তা, মাথা গোঁজবার সামান্যতম আশ্রয়, সন্তান-সন্ততির মানুষ হবার উপযুক্ত অবলম্বনের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে নায়কনায়িকার মনে, তারই ফলে ভবিষ্যতের সংসার রচনার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। দেশব্যাপী বেকারত্বের সর্বনাশা রূপ, বিজ্ঞানের যুগে ভাববিলাসী বাঙালী মনের অসহায় অবস্থা, বিকৃত যৌবনের পাশবিক চেহারা, জৈবিক ক্ষুধা, যুবশক্তির অনর্থক অপচয় প্রকাশ পেয়েছে বর্তমান সাহিত্যে। কর্মের চেয়ে ভাব-ভাবনা, রূপবর্ণনা অপেক্ষা মনের নানান জটিল আলোড়ন, এলোমেলো চিন্তার পসরা, অর্থনৈতিক প্রশ্ন, সাম্যবাদ-ধনতান্ত্রিকতার সংঘাত প্রাধান্য লাভ করেছে, সমস্যা জটিল হয়েছে এবং বহুধাবিভক্ত হয়ে বিষয়বস্তুকে জটিল করে তুলেছে। এর ফল হয়েছে এই যে, অপটু লেখকের হাতে পড়ে রচনা হয়েছে রস-আস্বাদনের অনুপযুক্ত।

বিদেশী ভাবধারা, পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনের প্রতিবিম্ব আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। রাশিয়ার গণবিপ্লব, গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা ও সেখানকার জনজাগরণ, দ্বিতীয় মহাসমরের পটভূমিকায় মানুষের দুঃখদুর্দশা, নূতন সমস্যার উদ্ভব এবং সম্প্রতি চীনের নবজাগরণ একদল বাঙালী লেখকের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তাই দেখা যায়, একদল তরুণ সাহিত্যিক একেবারে সমাজের অতি নীচেকার নরনারীর জীবনের দুঃখবিমথিত কাহিনীকে শোনাতে চান, মনুষ্যত্বের মুকুট পরিয়ে দিতে চান তাদের এতদিনকার নীচু-করে-থাকা মাথায়। এই প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে বিফল হয়েছে, নিছক অনুকরণের ফলে হাস্যকর হয়ে উঠেছে। দু-একজন ঔপন্যাসিক এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং তাঁদের পরিশ্রম সার্থক ও প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে।

অনুবাদ-সাহিত্যও ক্রমশঃ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হচ্ছে। টল্‌স্টয় হতে শুরু করে

ইলিয়া এরেনবুর্গ, পার্ল্ বাক, স্টিফেন জাইগ, এরিক মারিয়া রেমার্কে, ইলিয়ট প্রভৃতি বহু ঔপন্যাসিক কবির রচনা অনুবাদের দিকে একদল সাহিত্যিক মনোনিবেশ করেছেন। কতকগুলি চীনাগ্রন্থের অনুবাদও হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই উদ্যম শুভ সে বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। পৃথিবীর নানান দেশের ভাণ্ডার হতে যতই সম্পদ আহরণ করা যাবে আমাদের ভাণ্ডার ততই হবে পূর্ণ।

ভ্রমণ-কাহিনীর দিকেও অনেকে ঝুঁকেছেন। চীন, রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি পরিদর্শন করে এই-সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, শিক্ষামূলক প্রগতি, বিবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি ও গণচেতনার নূতন উন্মেষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বিভিন্ন তীর্থের বারি সঞ্চয় করেছেন শিল্পী সুলেখিকা রানী চন্দ তাঁর পূর্ণকুম্ভ-নামক গ্রন্থে। তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী রচনা করেছেন অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিক, কিন্তু সরস বর্ণনা ও অনবদ্য রচনা হিসাবে 'পূর্ণকুম্ভ' অভিনবত্বের দাবি রাখে।

এবার আসে রম্যরচনার কথা। এ হল এক ধরনের লঘু রচনা যার প্রভাব বাঙালী লেখক ও পাঠকের মনকে সমানভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রবন্ধের ভারগম্ভীর পরিবেশ ও তত্ত্ব এতে নেই। লেখকের সরস মন্তব্য, আর দু চোখে যা দেখেছেন তারই সঙ্গে কল্পনার কিছুটা খাদ মিশিয়ে রুচিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করে কৌশলের সঙ্গে বলার ভঙ্গী হল এ রচনার বৈশিষ্ট্য।

তবে এ কথা মানতেই হবে যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দীপ্তি কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। কি উপন্যাস, কি কবিতা, যে কোন শ্রেণীর রচনাতেই নেই বলিষ্ঠ লেখনীর অগ্নিগর্ভ প্রস্রবণ, উচ্চ ধরনের চিন্তা। তাই নাটক ও প্রবন্ধ রচনা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এর জন্য দায়ী হল সময় ও অবস্থা, এবং মনীষার অভাব। দেশ ভাগ হওয়ার পরে বাঙালী জাতির জীবন জুড়ে নেমে এসেছে নৈরাশ্যের কালো ছায়া, ব্যর্থতার শোচনীয় গ্লানি। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শুরু হয়েছে বহুবিধ পরিকল্পনা, জাতীয় জীবনের নয়াজাগরণ। সেই মুহূর্তে বিভক্ত বাংলায় বাঙালী ব্যস্ত সীমানার ওপার হতে চলে আসা শত শত গৃহহারা নিরন্ন মা-ভাই-বোনদের পুনর্বাসনে। বাংলাসাহিত্যসম্মেলনে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অবস্থা পর্যালোচনা করে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন—"...যেন একটা নমুনা সামনে রেখে তার সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যদ্রব্য সরবরাহ করার চেষ্টা।...মনের মধ্যে রয়েছে অপ্রসাদ, তাই ভাষার অস্পষ্টতা।..."

গণসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারলে যেমন বাহাদুরি লাভের সম্ভাবনা প্রচুর, সার্থক গণসাহিত্যের সৃষ্টি সেই পরিমাণে কঠোরসাধনাসাপেক্ষ। সাহিত্য হল শিল্পীর সাধনা। এ কথাটা ভুলে গেলেই যে-কোন সাহিত্যিকের রচনা হয় আদর্শচ্যুত, জনগণের কাছে তার আদর যায় কমে। কেবলমাত্র সাময়িক গণক্ষুধা মেটাতে যাঁরা সচেষ্ট তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে বিরাট ফাঁকি, সুযোগ বুঝে হাততালি লাভের চেষ্টা। যে সাহিত্য অমর শাশ্বত ও আদর্শনিষ্ঠ তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে বর্তমান কথাশিল্পী ও কবিকে। তবেই সকল জড়তা কাটিয়ে আমাদের বাংলা সাহিত্য বিশ্বের যে-কোন সাহিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়
তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

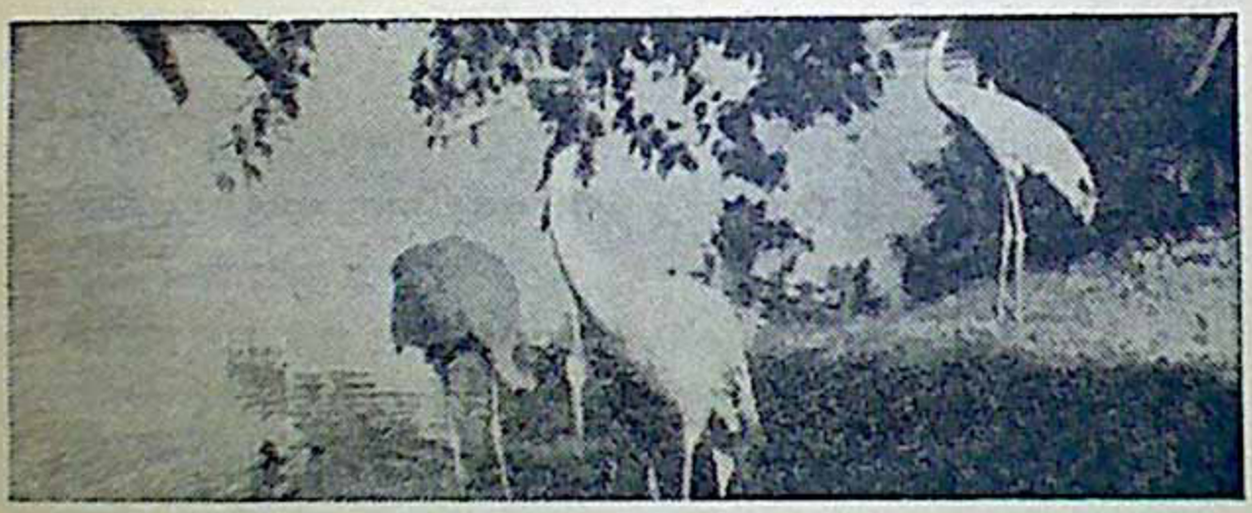

শরৎ-সাহিত্য-দর্শনে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর সম্ভব-পরিণতি

'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অনেক সমালোচকের মতে এই উপন্যাসটি সকল নীতি-আদর্শের ঊর্ধ্বে সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের এক মনোরম আলেখ্য। সামাজিক ও নৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রসৃষ্টিতে কবি ও শিল্পী বঙ্কিমের নৈপুণ্য বাংলার উপন্যাস-জগতে বিশিষ্ট আসনের দাবি রাখে। লেখক তাঁর মনোবৃত্তিকে সমস্ত অশ্লীলতার ঊর্ধ্বে এক পবিত্রতার বেদীমূলে উৎসর্গ করেছেন। উপন্যাসের জটিলতাকে সৃষ্টি করতে যে-সমস্ত ঘটনার প্রয়োজন, লেখক সে-সমস্তগুলিকে নিপুণ শিল্পীর মতো যোজনা করেছেন। ভ্রমর-গোবিন্দলালের পূতপ্রেম —রোহিণীর সংস্পর্শে গোবিন্দলালের পদস্খলন—রোহিণীকে নিয়ে গোবিন্দলালের সংসার ত্যাগ—অভিমানিনী ভ্রমরের আত্মত্যাগ—পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয়—গোবিন্দলালের হাতে রোহিণীর মৃত্যু—এদের কোনটাকে বাদ দিলে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠত না।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-দর্শন দিয়ে বিচার করলে উপন্যাসটির পরিণতি কি হতে পারে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর প্রধান সমস্যাবহুল চরিত্র হচ্ছে রোহিণী। অন্যান্য সমস্ত চরিত্রের শরৎচন্দ্রের চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে। বঙ্কিমের ভ্রমর অভিমানিনী; তাহার হৃদয়ে যতখানি প্রেম ছিল, ঠিক ততখানি ধৈর্য ছিল না। ভ্রমরের আত্মবিশ্বাস ছিল, কিন্তু স্বামীর প্রতি সামান্য কারণে সন্দেহ তাকে বিষময়-পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। ভ্রমরের মৃত্যু আর্টের দিক থেকে দূষণীয় কি না বলতে পারি না, কিন্তু তার মৃত্যু যে-কোন দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে, অভিমানই তার মৃত্যুর মূল কারণ। ভ্রমর যে স্বামীকে এতখানি ভালবাসে, সেখানে সে গোবিন্দলাল অপেক্ষা রোহিণীকেই বিশ্বাস করল বেশী। শরৎচন্দ্রের একটি চরিত্র আছে যার জীবনে অভিমান সমস্ত রকমের ব্যর্থতা এনে দিলে। যেখানে ক্ষণিক ভুল ও অভিমান চরিত্রের পরিণতির কারণ হয়ে থাকে, সে পরিণতি শুধু কেবল হাহাকারে শেষ হতে বাধ্য। শরৎচন্দ্রের সে চরিত্র হচ্ছে পার্বতী। পাপের চোখ-ঝল্‌সানো দৃষ্টিতে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, পুণ্যের অমিয়তা সব সময় তাকে ধরে রাখতে পারে না; তাই পুণ্যময়ী সতী ভ্রমর গোবিন্দলালকে ধরে রাখতে পারল না। এ চরিত্রসৃষ্টিতে কোন অবাস্তবতা নেই—এ কথা শরৎচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন।

বাকি আছে রোহিণী। রোহিণীর পাপাসক্ত নিশ্বাস ভ্রমর-গোবিন্দলালের সোনার

সংসার বিষিয়ে দিলে। রোহিণীর কামাসক্ত অভিনয় উপন্যাসের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত এক এক করে যে অপরিহার্য পরিণতির দিকে নিয়ে গেল, সেটা কোন বঙ্কিম-সাহিত্য-পন্থী লেখকের চোখে অবান্তর বলে মনে হবে না। রোহিণীর চরিত্র অঙ্কন সম্বন্ধে বঙ্কিমী শিল্পসৌন্দর্যের কোন অবান্তবতা আছে কি না লক্ষ্য করার বিষয়। অনেকের মতে রোহিণীর জীবনের আরম্ভ থেকে শেষের মধ্যে যেন একটা খাপছাড়া যোগ আছে। তিনি বোধ হয় তাঁর নীতিকে অতিক্রম করে রোহিণীকে নারী জাতির আসনে বসাতে চেয়েছিলেন। হরলালের জন্যে যে উইল চুরি সেটা বোধ হয় তার কেবলমাত্র মোহাবিষ্ট অন্তরের পরিচয় নয়। তার পর গোবিন্দলালের প্রতি আসক্তি, সেটা বেশ একটা রুচিবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যদি তা না হত তা হলে সে প্রিয়তমের মঙ্গলের জন্যে বারুণী পুষ্করিণীতে আত্মহত্যার চেষ্টার সার্থকতা থাকত না। দোষ মানুষের থাকবেই; কিন্তু বিশেষ দোষ দিয়ে মানুষের সামগ্রিক জীবনকে বিচার করা চলে না। 'সংসারে শুধু দিলেই যারা, পেলে না কিছু', তাদের পরিপ্রেক্ষিতে রোহিণীকে এ ব্যাপারে বিচার করলে, বিচারের নামে প্রহসনই করা হবে বেশী। রোহিণীর গোবিন্দলালের সঙ্গে গৃহত্যাগ পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা চলে, কিন্তু এই ঘটনার পরে মাত্র ক্ষণিকের দৃষ্টিতে নিশাকরের প্রতি আসক্তি কোন্ নীতিতে যে সম্ভব তা বলা শক্ত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-ভঙ্গীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। এটার কারণ, তাঁর নীতি-আদর্শের উগ্রতা। তিনি যে জটিলতার মধ্যে পড়েছিলেন, এ ছাড়া তার অন্য কোন সমাধান ছিল না। নারীত্বের ব্যাপকতা থেকে সতীত্বের সংকীর্ণতার মধ্যে রোহিণীর যে জীবন-বিপর্যয় সেটার জন্যে বঙ্কিমী নীতিই দায়ী। "কেবল স্বল্পকালব্যাপী চেষ্টার পর এই পঙ্কিল-প্রবাহকে সূর্যালোকে তুলিয়া ধরিয়া, তাহার পর এক অবিশ্রান্ত দ্রুতগতিতে তাহাকে মরণের উপকূলে লইয়া প্রায়শ্চিত্ত-পর্বতের শিখরদেশ হইতে মৃত্যুর অতল শূন্যতার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। পতনের প্রতিধ্বনি আমাদের কানে বাজিতে থাকে। একটা প্রাণবেগ-চঞ্চল বিপুল শক্তির অতর্কিত অন্তর্ধানের বিরাট শূন্যতায় আমাদের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে; কিন্তু এই শক্তির প্রতিদিনের ক্রিয়া লেখক আমাদিগকে দেখিতে দেন না।"

বঙ্কিমচন্দ্র সতীত্বের মর্যাদা দিয়ে তাঁর সমস্ত উপন্যাসের নারী-চরিত্রগুলিকে এককেন্দ্রিক করে তুলেছেন। সেখানে নারী-জীবনের সতীত্ব ছাড়া আর যা কিছু তাকে বর্জনা করে তাঁর আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেন নি। "বঙ্কিম রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রণয়লীলা সম্বন্ধে প্রায় মৌন রহিয়াছেন, কিন্তু ভ্রমরের সপ্তবর্ষব্যাপী অভিমান, ছুর্বিষহ প্রতীক্ষা একটু বিস্তারিত ভাবেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না। অকালে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর জীবনে সব মাধুর্য যে নষ্ট হয়ে যাবে এমন কথা বলা সংগত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নারী-জীবনের একটা দিক দেখেছেন; সেটা তার সতীত্ব। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অতৃপ্ত হৃদয়ের সন্ধান নেওয়া সম্ভব নয় কেন? রোহিণী অকালে বিধবা হবে বলে তার নারীজীবনের কোন অধিকার নেই? শরৎচন্দ্র এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাঁর রমা-রমেশের প্রেমকে স্বীকার করে। যেখানে সাবিত্রী, অভয়া, রাজলক্ষ্মী, এমনকি কিরণময়ীও শরৎচন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে, সেখানে রোহিণীর সম্বন্ধে তো কোন প্রশ্নই ওঠা সম্ভব নয়। সাবিত্রী-সতীশ, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত, কিরণময়ী-দিবাকরের যে সম্বন্ধ সেটা কোন বঙ্কিমী-সাহিত্যিক সহ্য করতে পারে না। সুতরাং তাঁদের পক্ষে রোহিণী-গোবিন্দলালের সম্পর্ক এক অসহনীয় ঘটনা। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নারীর সমষ্টিগত জীবনকে—সতীত্ব ও নারীত্বকে—রূপ দিয়েছে। সবিতা পতিতা হলেও সমাজ-সম্পর্কিত নীতি তাকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি। পতিতা হলেও তার জীবনের অন্যান্য গুণ—মাতৃত্ব, সেবাবৃত্তি প্রভৃতি থাকতে পারে কি না তারই আলেখ্য শরৎচন্দ্রের হাতে প্রকাশ পেয়েছে। বাইজী রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে খুব ভালবাসে, তবুও বন্ধুর সামনে সে তার মাতৃত্বমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি; তাই সে শ্রীকান্তকে বিদায় দিতে বাধ্য হল। পতিতা স্ত্রীর হাতের সেবা নিতে শেষ জীবনে উপেন্দ্রবাবু দ্বিধা করেন না। জীবানন্দ ভৈরবীর হাত থেকে বিষাক্ত ওষুধও গ্রহণ করেছিলেন। সাবিত্রী আপাতদৃষ্টিতে চরিত্রহীনা হলেও তার জীবনের অন্যান্য সমস্ত গুণকে বাঁচিয়ে পুরুষকে সেবা করেছে অথচ ধরা দিয়েও ধরা দেয় নি। তবুও তারা সমাজের চোখে হীন!

রোহিণী বিধবা হতে পারে; কিন্তু সেটা তো তার নিজের হাতের সৃষ্টি নয়। তবে কেন সে সব সুখ থেকে বঞ্চিত হবে? কেন সে একটা হাহাকারের মধ্যে তার সমস্ত জীবনের মধুর উপলব্ধিকে বিসর্জন দেবে? অনেকের ধারণা, এমন চরিত্রকে সাহিত্যে প্রশ্রয় দিলে সমাজের কাঠামো থাকবে কোথায়? শরৎচন্দ্রের মতে সেটা সমাজসংস্কারকের কাজ—সত্যিকার সাহিত্যিকের কাজ নয়। যেখানে সৌন্দর্য সেখানে সাহিত্য। কোন চরিত্রকে রোহিণীর মত গুলির আঘাতে হত্যা করলে সমাজের মানদণ্ডকে খাড়া করা হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্যের অকালমৃত্যু ঘটে। অবশ্য এখানে একটি কথা বলার আছে। রোহিণীর এই নিশ্চিত পরিণতির জন্যে লেখক যদি সমুচিত ক্ষেত্র রচনা করে রাখতেন তবে বলার বিশেষ কিছু ছিল না। যখন পাঠকসমাজ যুগধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসটির নূতন কোন এক পরিণতির আশা করছিলেন, তখনই দেখা গেল লেখকের হাতে রোহিণী গুলির আঘাতে মরল।

রোহিণী বালবিধবা হতে পারে, কিন্তু তার রূপ আছে, বয়স আছে, গোবিন্দলালের প্রতি তার ব্যবহার কোন গুণের প্রতিকূল নয়। বঙ্কিমী নীতির মতে যখন তাকে গুলির আঘাতে মারা হল, তখনই সাহিত্যের আর্ট নষ্ট হয়ে গেল। অবৈধ-প্রণয়ে পাপ, কিন্তু অবৈধতার সংজ্ঞা কি? তার জীবনের প্রতিটি মাধুর্যকে ফুটিয়ে তোলার থেকে তাকে গুলি করে মারা মানবজীবনের যে কোন্ ধর্মের অনুকূল শরৎচন্দ্র তা বোঝেন নি। শরৎচন্দ্র, "বঙ্কিমের আর্টে অসংগতি ও অস্বাভাবিকতার উদাহরণ স্বরূপ রোহিণীর অপঘাত মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, রোহিণীকে ঐরূপ অকস্মাৎ মারিয়া ফেলিয়া বঙ্কিম সামাজিক ধর্মনীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কলাবিদের কর্তব্য বিসর্জন দিয়াছেন। রোহিণীকে বলি দিয়া সমাজধর্মের ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটির গতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যেখানে রোহিণীকে না মেরে উপায় নেই। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের গতিনিয়ন্ত্রণে যদি ভুল হয়ে থাকে তবে রোহিণীর মরণই যে বিশ্বসত্য এমন কথা বলার পক্ষে কী যুক্তি আছে? "রোহিণীর অকস্মাৎ মৃত্যু যেন একটা খুব জটিল সমস্যার অন্যায়-রূপ সুলভ সমাধান।"

উপন্যাসের চরিত্র মরুক তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাকে কেবল উপন্যাসের খাতিরেই মরা উচিত। বাহিরের প্রভাব ও ক্ষণেকের ভুলে কোন উপন্যাসের পরিণতি সম্ভব হলে সে উপন্যাস সার্থক হয় না। শরৎচন্দ্র বলেছেন, "রোহিণীর মৃত্যুর জন্যে আক্ষেপ করি নে। কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তির অপমৃত্যুতে। হতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির convention সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই। কিন্তু মরল সে—তার সঙ্গে সত্য সুন্দর Art. উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে। নীতির চোপরাঙানিতে তার মরা চলে না।"

উপন্যাসটির এই যে সমস্যা শরৎচন্দ্র সে সমস্যার সমাধান কেমন ভাবে শেষ করতেন সেটা তাঁর নিজস্ব নীতি দিয়েই বিচার করা সংগত। একটা স্বাভাবিক গতির মধ্য দিয়েই যদি উপন্যাসটির শেষ হত তা হলে শরৎ-নীতির স্বাভাবিকতা এর মধ্যে ফুটে উঠত আর তার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ-নীতির আদর্শে উপন্যাসটি শেষ হত। যেখানে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, সেখানে পরিণতির পার্থক্য থাকবেই।

শ্রীদিলীপকুমার
চতুর্থ বর্ষ। সাহিত্য

শিশু-রংমহল প্রসঙ্গে

শারদীয় দুর্গোৎসবের নামে বাঙালী হিন্দুর প্রাণ যেমন নেচে ওঠে তেমনি আনন্দে নেচে ওঠে কলকাতা-শিশুসমাজের হৃদয় শিশু-উৎসবের নামে। শীতের শেষে বসন্তের প্রারম্ভে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরের প্রাঙ্গণে যে সাতদিনব্যাপী শিশু-উৎসবের আয়োজন গত তিন বছর ধরে হয়ে আসছে তাতে উপস্থিত থাকলেই সেটা বেশ অনুভব করা যায়। একে একে নানা পাখির দল যখন ছন্দ মিলিয়ে নেচে চলে যায়, কিংবা যখন চাঁদাবুড়ী আকাশ থেকে নেমে এসে হাজির হন মঞ্চে, তখন রূপমঞ্চ আর মঞ্চ থাকে না—দেখা দেয় রূপকথা-রাজ্যের রূপে। বাস্তব জীবনের কোন কথাই আর তখন তাদের মনে স্থান পায় না, এমনকি বই-এর সেই মোটা মোটা কালো অক্ষরগুলোকেও মঞ্চের উপরে নেচে যেতে দেখা যাওয়ায় সব মিলিয়ে তাদের প্রতিও আর সে ভীতিভাব থাকে না। আর তখনই হয় শিশু-রংমহলের কর্মপ্রচেষ্টার চরম সাফল্য।

যুগের আবর্তন আর বিবর্তনের সঙ্গে চলে জাগতিক পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে আজ প্রায় চার বছর আগে কয়েকজন শিশু-হিতাকাঙ্ক্ষী ভদ্রলোক লক্ষ্য করেছিলেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে গতানুগতিক প্রাচীন নীরস ব্যবস্থায় চলবে না, তার জন্য চাই শিক্ষণীয় আনন্দরসের খোরাক। আর কেবল পুঁথিগত শিক্ষাই নয়, বর্তমান কালোপযোগী ব্যাপকতার দৃষ্টিভঙ্গী সর্বতোবিষয়ে যাতে করে গড়ে ওঠে সেটাও দেখা প্রয়োজন। কেবল চিন্তায় মাথা না ঘামিয়ে অবশেষে কাজেও নেমে পড়া গেল। ১৯৫২ সালের ১১ই মে। ভারতের শিশুজগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। বহুলোকের অজ্ঞাতসারে ২৩১টি শিশু নিয়ে কলকাতার নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে হল ছোট্ট একটি শিশু-প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন। মনে তখন আশাও আছে, আশঙ্কাও আছে। কিন্তু তা ক্ষণিকের। দর্শকবৃন্দের বিপুল অভিনন্দন সমস্ত সন্দেহ দূর করে এনে দিল এক বিরাট উৎসাহ। ফলে আবার দেখা দিল নিউ এম্পায়ারে এদের উৎসব, এবারে (১২ অগাস্ট, ১৯৫২) শিশুর সংখ্যা ২৩১ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ২৬১-তে। ১৪টি প্রধান প্রধান স্কুল এসে দাঁড়াল এই শিশু-প্রতিষ্ঠানের পাশে। এবারেও বিরাট সাফল্য। সাফল্য এনে দিল প্রেরণা। তখন মনে হল স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলবার বিরাট প্রয়োজনীয়তা। তাই দিন কয়েকের মধ্যেই সরকারীভাবে রেজিস্ট্রি করা হল শিশু-রংমহল বা Children's

Little Theatre (সংক্ষেপে C.L.T.)। কার্যসূচী, আইন-কানুন তৈরী হতেও আর দেরি হল না।

আর আজ এখন শিশু-রংমহলের কার্যপদ্ধতি কেবল বিরাটই নয়, বিচিত্রও হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখানে তার বিস্তারিত বিবরণের আয়োজন সম্ভবপর নয়, প্রয়োজনও নেই। তবে একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়; সেটা হচ্ছে যে, শিশু-রংমহল আজ আর একটা শিশুদের নাচের স্কুল-জাতীয় মনে করাটা নেহাৎ ভুল হবে, কারণ শিশু-রংমহলের অনুমোদিত অনেক বড় বড় স্কুল, বিশেষ করে নার্সারি স্কুল, ও এমনকি অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও আছে যাদের সমষ্টিভুক্ত ফল নিয়ে হয় শিশু-উৎসব। শিশু-রংমহল থেকে তাদের সকল রকম সাহায্যের ব্যবস্থাও আছে। অবশ্য শিশু-রংমহলের নিজস্ব একটি Training Centre-ও আছে। আর সেখানে তৈরী জিনিসই হয় শিশুদের আনন্দমেলার প্রধান আকর্ষণ। ছন্দের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যের সুপ্ত শিল্পানুভূতি জাগিয়ে তোলবার অপূর্ব ব্যবস্থা আছে এখানে; আর আছে শিশু-হৃদয়ের রূপকথার রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষার অপূর্ব ব্যবস্থা। আছে মায়েদের নিয়ে Mother Committee, আছে K. G. শিক্ষকদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা, আর আছেন শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল নানা ব্যক্তি। সবাই মিলে ফন্দি এঁটে কখন চুপি চুপি উঁকি দিয়ে শিশুর মনের কথাটা জেনে নেয় সেটা তারা জানতেও পারে না। অনুরূপ ব্যবস্থা আছে অঙ্কন-কলা বিভাগেও। শিশু লিখতে শিখবার আগে আঁকতে চেষ্টা করে, কাজেই তাদের মনের ভাব ছবিতে যতটা ধরা পড়ে, অন্য কিছুতে ততটা পড়ে না। কাজেই তাদের ছবির মাধ্যমে তাদের মনের অবস্থাটা জেনে নিয়ে সব মিলিয়ে যখন নতুন ছড়া, ছন্দ ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে আবার হাজির করা হয় তখন সেটা তাদের একান্ত নিজের জিনিস বলে তাদের কাছে চমৎকার লাগে। আরও সুন্দর ব্যবস্থা আছে অঙ্কন-কলা বিভাগে। সেখানে, আজকাল শিশু-রংমহলের নূতন যে-সমস্ত নৃত্যনাট্য রচিত হচ্ছে সেগুলো প্রথমে শিশুদের পড়ে শোনানো হয়। তারা সেটা শুনে নিজের রুচিতে মঞ্চ-সজ্জার জন্য ডিজাইন তৈরী করে। তার পর সেই-সব ছবিগুলি থেকে কতকগুলি মনোনীত করে নিয়ে তারাই আবার বড় করে কাগজে তেলা রং দিয়ে এঁকে শিশু-রংমহলের মঞ্চ-সজ্জা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মন-মতো তৈরী করে নেয়। আমাদের শিল্প-শিক্ষক কেবল দূর থেকে দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু শিশু-উৎসবের অপূর্ব রূপে মঞ্চের আনন্দের হাটে যখন আপনি আপনার মনকে খুঁজে পাবেন না তখন আপনার একবার মনে পড়বে না এ ক্ষুদে শিল্পীদের কথা। কিন্তু তার জন্য এরা থোড়াই কেয়ার করে।

এরা যে এখন শিল্পী হয়েছে। তাই তারা কাজ করে যায় নীরবে, নিভৃতে, সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশে। তাদের কাজের পেছনে প্রশংসার বিশেষ ক্ষুধা নেই, আত্মদম্ভের লেশমাত্রও নেই, আছে শুধু শিশুচিত্তের সুকোমল ভাবটির সুন্দর অভিব্যক্তি। তাদের চিত্রের চিরন্তন আবেদন ও সহজ আকর্ষণ আপনার মনকে টেনে নেবেই, যদি আপনি আমাদের শিশুকলা-প্রদর্শনী দেখেন। বহু প্রতিষ্ঠানের শিশুদের আঁকা ছবি নিয়ে এই প্রদর্শনী প্রতি বছর শিশু-উৎসবের সময়ে হয়ে আসছে।

অবশ্য, প্রথম বৎসরের শিশু-উৎসবে এ প্রদর্শনী করা সম্ভব হয় নি। ১৯৫৩ সালে ২৩শে জানুয়ারি সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় শিশু-উৎসবের আয়োজন করে শিশু-রংমহল। ৬০ ফুট লম্বা আর ৪০ ফুট চওড়া বিরাট 'স্টেজে' বিভিন্ন দিনে বাঙালী, ওড়িয়া, নেপালী, অসমীয়া থেকে সুরু করে মায় চীনে, ফরাসী, রুশীয় প্রভৃতি মিলে প্রায় সাড়ে চার শো শিশু নেচে গেয়ে, অভিনয় করে চলে যায়। সে যে কী চমৎকার, কী সুন্দর, তা শিশু-উৎসব যিনি কোনদিন দেখেন নি, তাঁকে বোঝানো সম্ভব নয়। আর যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ছোট হন বা বড়ই হন, বাড়ি গিয়ে নিজের অলক্ষ্যে কখনও কখনও দু ছত্র ছড়া বলে ফেলেছেন গুন্ গুন্ করে, কিংবা গেয়ে ফেলেছেন দু লাইন গান। তবে তার চেয়েও সুন্দর হয়েছে দ্বিতীয় বারের শিশু-উৎসবে (12th Feb. 1954)। এক একদিন হাজার হাজার লোক এসে দেখে গেছেন 'অবন পটুয়া', 'সাতভাই চম্পা', 'কবির লড়াই', আরও কত কি! কত গণ্যমান্য লোক এসে দেখে গেছেন, মনের ভেতর থেকে পঞ্চমুখে প্রশংসা করে গেছেন। এমনি একটি দিনে এসে হাজির হয়েছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জুলিয়ান হাক্সলে। তিনি কেবল গতানুগতিক প্রশংসা না করে 'ইউনেস্কো'র মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে এই অভিনব 'আইডিয়া' ছড়িয়ে দেবার পথ দেখিয়ে দিলেন।

তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হল 'দিল্লী নাট্যসংঘের' সঙ্গে C.L.T.-র যোগাযোগ। তাঁরা আহ্বান জানালেন দিল্লী গিয়ে উৎসব করবার। আর শুধু দিল্লী নয়, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস প্রভৃতি সারা ভারতের আরও অনেক জায়গা থেকে এল আহ্বান। কিন্তু শিশুদের স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করে কেবল দিল্লী-ভ্রমণই গ্রহণ করা হল।

বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে প্রায় ১৫০ জনের এক বিরাট দল নিয়ে এক শিশু আজাদ হিন্দ ফৌজ 'দিল্লী চলো' রব তুলে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হল, তাদের প্রিয় 'নেহেরু-কাকা'কে নাচ দেখাবে বলে। শিশুদের নিয়ে এরকম troup এর আগে ভারতে আর হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু যাতায়াতের পথে তারা রেল-কর্তৃপক্ষ ও

বিহারের কতিপয় কলেজের ছাত্রের কাছ থেকে এমন বিশ্রী ব্যবহার পেয়েছিল, যা স্বাধীন ভারত নয়, সভ্য ভারতের ইতিহাসে একটি কলঙ্কের বিষয়।

যা হোক, আমরা ৬।৭ জন আগেই চলে গিয়েছিলাম ব্যবস্থাপনার জন্য। সেখানেও নানা বাধা। সেগুলো কোন রকমে অতিক্রম করে অনেক কষ্টে সব ব্যবস্থাও করা গেল। একটা 'ওপন এয়ার থিয়েটার'কে কোনক্রমে সাজিয়ে একটা সুন্দর প্যাণ্ডেল তৈরী করা গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। যেদিন 'শো' তার আগের দিনই প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে প্যাণ্ডেল গেল ভেঙে। পরের দিন গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড 'অডিটোরিয়াম' শীতের কন্‌কনে হিমেল হাওয়ায় প্যাণ্ডেলের ত্রিপল জড়িয়ে দিব্যি আরামে ঘুম দিয়েছে, সে ঘুম অন্ততঃ দিন কয়েকের মধ্যে ভাঙবার কোন সম্ভাবনাই আর নেই। অথচ সেদিনই শো। শেষ মুহূর্তে অনেক খুঁজে যদিও বা একটা হল পাওয়া গেল, তাও সেটা মাপে এত ছোট যে পকেট-সাইজ একেবারে। বাধ্য হয়ে দিনে দুটো শো করতে হল। বড়ই আশ্চর্য যে, এত পরিশ্রম, তার ওপর রিহার্সাল, তা সত্বেও কোন দিন কোন শিশুকে ক্লান্ত হতে দেখি নি, বরং তাদের দেখেছি অবিশ্রান্ত ভাবে নেচে চলেছে আর মুখে তো 'মাসী গো মাসী, পাচ্ছে হাসি' প্রভৃতি লেগেই আছে। যা হোক তাদের পরিশ্রম বৃথা হয় নি। চারদিন-ব্যাপী বিভিন্ন উৎসবে বিরাট জনতার বিপুল অভিনন্দন এনে দিয়েছে সার্থকতা। সব চেয়ে বড় সাফল্য হয়েছিল প্রথম দিনেই। সেদিন 'নেহেরু কাকা' এসে দু ঘণ্টা ব্যাপী পুরো একটা 'শো' দেখে যান। 'শো' শেষ হলে মঞ্চে উঠে তিনি শিশু শিল্পীদের অভিনন্দন জানাতে এসে মুক্তকণ্ঠে বলে যান, 'এ অনুষ্ঠান আমার অনেক অনেক দিন মনে থাকবে'। জনতার চিন্তাধারা যিনি সব চেয়ে বেশী উপলব্ধি করতে পারেন তিনি সেদিন জনতার মনের কথাটাই বলে ফেলেছিলেন। বাস্তবিক, নয়াদিল্লীর অধিবাসী, বিশেষ করে যাঁরা বাঙালী তাঁরা, কখনও ভুলতে পারবেন না শিশু-রূপমঞ্চে সেই ফুল ফুটে ওঠার দৃশ্য, কিংবা 'কবির লড়াই'-এর 'চিড়িয়াখানার পন্থ' :

'বাঘ যতই পাজী, বদমেজাজী হোক না কেন সে,
খেলে কাতুকুতু খিলখিলিয়ে উঠবে সে হেসে।'

শুধু জনতাই নয়, নয়াদিল্লীর প্রধানমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মপ্রকাশও 'ফাইন আর্ট সোসাইটি'র একজিবিশন-হলে আমাদের অঙ্কনকলা-প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে এসে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন। তা ছাড়া কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর এবং আরও অনেক গণ্যমান্য লোক এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। অবশ্য হুমায়ুন কবীরকে আমি ঠিক দর্শক হিসাবে বলতে পারি না, কারণ দিল্লীতে তিনিই ছিলেন আমাদের অভিভাবক।

সর্বদা তাঁর সহায়তা থাকায় দিল্লীতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এবং তাঁর সহায়তাতেই অবশেষে C.L.T.-র উল্টোরথ আগ্রা হয়ে ঘরে ফিরে এল।

ফিরে এসেই প্রস্তুতি চলল তৃতীয় বার্ষিক শিশু-উৎসবের। সেই সপ্তাহব্যাপী শিশু-উৎসবই হয়ে গেল যাদুঘর-প্রাঙ্গণে গত জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে। প্রথম বৎসর যারা 'চড়ুই ভাতি' দিয়ে আনন্দ দিয়েছিল দ্বিতীয় বার তারাই 'অবন পটুয়া' দিয়ে মুগ্ধ করল, আর তৃতীয় বার তারাই 'মিঠুয়া' দিয়ে আশ্চর্য করল। এবারকার প্রধান আকর্ষণ ছিল 'মিঠুয়া', 'রথের মেলা' আর পল্লীর অনাড়ম্বর অথচ আবেদনবহুল চিত্র 'চড়ুই ভাতি' নৃত্যনাট্য (নব পরিকল্পনায়)। তা ছাড়া আর-একটা জিনিসে এবারে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। সেটা হচ্ছে School-room rhyme অর্থাৎ স্কুলঘরের নাচ। শিশু-রঙমহলের একান্ত নিজস্ব জিনিস হচ্ছে ওগুলো। বিদ্যালয়ে পড়ার মধ্যে ছন্দ ও আনন্দ এনে দেয়—তাদের সুপ্ত ক্ষমতাটিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য হচ্ছে এ প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টা যাতে সব স্কুলেই থাকে সেদিকেও নজর দেওয়া হয়। তা ছাড়া অন্যান্য বারের মত হয়েছে বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য। দার্জিলিং থেকে আগত নেপালীদের লোকনৃত্য হয়েছে সবচেয়ে বেশী প্রাণবন্ত। ওড়িয়াদেরটা বেশী 'ক্লাসিকেল' হওয়ায় ততটা প্রাণবন্ত হতে পারে নি। শিশুদের উৎসব তো। তাই বলে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ চলে না এ বিষয়ে ; যেমন অভিযোগ চলে না C.L.T.-র বিরুদ্ধে, ছেলেরা অবহেলিত বলে। যে ছেলেরা 'কবির লড়াই' দেখিয়ে হাসির চোটে পেটে খিল ধরিয়েছে তারাই আবার আনল 'চিঠি'। মনে থাকবে ছোট-ছেলেটার কথা :

'টপাটপ করে দাদা একা টফি খাচ্ছ,
ছোট্ট এ ভাইটাকে দেখতে কি পাচ্ছ ?'

'মিঠুয়া'র 'মেকানিকেল ডান্স' সম্বন্ধে যদি কেউ অভিযোগ করেন আরও ভুল করবেন। কারণ, দেখতে যতটা সোজা মনে হয় আসলে 'মিঠুয়া'র তৈরী করা অভিনয় করা ততটা সহজ নয়। তা ছাড়া ভুলে যাবেন না, যারা ছোট্ট পাখি সেজে বলছে :

'তা তিনি তাক তেনাক যাদু ধিনাক নাতিন তিনা—
ফিঙে দোয়েল শালিখ নাচে তা তিনি তাক তিনা।'

তারাই আবার 'অবন পটুয়া'তে বলেছে :

'তুলি দিয়ে এঁকে দেই লাল নদী উত্তাল,
রাঙা মাটি ভেঙে পড়ে, ফুলে ওঠে রাঙা পাল।

লাল চেলি পরে হায় রাঙাবধূ ঘুম যায়,
লাল গাঁয়ে লাল কুঠি ঢাকঢোল বাজছে।
সব লাল লাল্‌চে।'

মিঠুয়াতেও তারাই 'ডাকবাক্স' সেজে বলছে :

'চিঠি আছে? চিঠি নেই—দিন নেই, রাত নেই, ছুটি নেই।'

বৈচিত্র্যের মধ্যে মূলগত ঐক্যরক্ষা, তার মধ্যেই তো শিল্পের প্রাণ। কাজেই ছড়া-ছন্দোবৈচিত্র্য হলেই হয় না, নৃত্য-বৈচিত্র্যও চাই। আর মিঠুয়া সেই বৈচিত্র্যের একটি নমুনা।

অবশ্য 'অবন পটুয়া'র choreography শিশুদের মত নয় বা 'মিঠুয়া' গল্পের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অনেক গলদ চোখে পড়ে। এমনকি 'মিঠুয়া'তে মিঠুয়া-চরিত্রকে নাম-ভূমিকা না বলে নামমাত্র ভূমিকা বলেও অভিযোগ তুলতে কেউ পারে না। তবে একটা কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত; সেটা হচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠান একেবারে নূতন; গলদ কিছু থাকতে পারেই; তবে অগ্রগতিটাই এখানে বিরাট। সমালোচনা করবার সময় সে কথাটাই ভেবে দেখা উচিত; তাতে সুবিচার হয়। সুবিচারের মধ্যে আছে প্রীতির স্পর্শ আর অবিচারের মধ্যে হিংসার; সে হিংসায় সব সময়েই বিশেষ কোন কারণ থাকতে হয় না।

যা হোক, শিশুদের নিয়ে ভালভাবে কোন কিছু গড়তে হলে শিশু-রংমহলের অভিনব নীতি গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত হবে। আর শিশু-রংমহলের উচিত হবে দলাদলি অশান্তি থেকে সম্পূর্ণ দূরে থেকে সমাজের সমস্ত স্তরে তাদের মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়া। শিশু-রংমহল হবে না কলকাতার, হবে না বাংলার, এমনকি ভারতেরও নয়; শিশু-রংমহল হবে বিশ্বজনীন। সমগ্র জগতের শিশু-সমাজের, এবং বড় হয়ে যারা শিশুর মত, তাদের জন্য থাকবে এর দ্বার অবারিত।

শ্রীদীপক চাকলাদার
তৃতীয় বর্ষ। বিজ্ঞান
সদস্য। শিশু-রংমহল

রম্যরচনা

সাহিত্য স্থিতিশীল নয়, গতিশীল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনদর্শন আর সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন কেবল হয় না, সাহিত্যের বিষয়বস্তু আর প্রকাশভঙ্গীরও রূপান্তর সাধিত হয়। সাম্প্রতিক কালে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক ধরনের লঘুরচনার প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে; এই শ্রেণীর রচনাকে পাঠক-সম্প্রদায় এবং সমালোচকবৃন্দ রম্যরচনা নামে অভিহিত করে থাকেন। এখন এই রম্যরচনার সংজ্ঞা কি এ প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধের অবকাশ আছে। নানাপ্রকার বিরুদ্ধ মত থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে রম্যরচনার একটা সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। বিখ্যাত সমালোচক জন্‌সন্ সাহেব প্রবন্ধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, প্রবন্ধ হল "a loose sally of the mind, an irregular, undigested piece, not a regular and orderly composition." বিখ্যাত সমালোচক জন্‌সনের প্রতি কোনপ্রকার অশ্রদ্ধা না দেখিয়ে, অত্যন্ত বিনীতভাবে আমরা বলব যে, এটা প্রবন্ধের সংজ্ঞা হল না। এটাকে বরং আমরা রম্যরচনার সংজ্ঞা বলতে পারি। সাধারণভাবে রম্যরচনা বলতে আমরা বুঝব একশ্রেণীর তরল রচনা, যার বিষয়বস্তু আমাদের ব্যক্তিজীবন বা বৃহত্তর সমাজজীবনের যে কোন ঘটনা, যে কোন বিষয় বা বস্তু, অথবা যে কোন ব্যক্তিচরিত্র। এই শ্রেণীর রচনাকে, বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস সৃষ্টি করে মধুর ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়। অবশ্য আমার এই সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনার অবকাশ আছে। থাকাও খুব স্বাভাবিক। কোন কিছুর, বিশেষ করে সাহিত্য-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের যথার্থ আর নির্ভুল সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হবে। সংজ্ঞার কোন সার্বজনীন ভিত্তি নেই।

এখন দেখা যাক, রম্যরচনার সংজ্ঞা যদি উপরোক্ত অনুচ্ছেদে লিখিত সংজ্ঞা হয়, তবে রম্যরচনার বৈশিষ্ট্য কি। এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে, প্রবন্ধের সঙ্গে রম্যরচনার অতি অবশ্যই পার্থক্য আছে। প্রবন্ধে চিন্তার সংহত এবং সংযত রূপের যে প্রয়োজন, অনাবশ্যক আবেগপ্রবণতা বাদ দিয়ে মূল বক্তব্যকে যুক্তি-পরম্পরায় বিস্তারিত এবং পরিণামে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার যে সাধারণ পদ্ধতি, রম্যরচনাতে তা থাকে না। রম্যরচনার বিষয়বস্তু হয় সাধারণতঃ লঘু। কোন দুরূহ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে রম্যরচনা রচিত হয় না। যে কোন সামান্য বিষয়, অতি তুচ্ছ বস্তু

নিয়েও রম্যরচনা রচিত হতে পারে। রম্যরচনার মধ্য দিয়ে রচনাকারের ব্যক্তিমানস বা personalityর পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। অবশ্য সাহিত্যের সব বিভাগের সৃষ্টিতে স্রষ্টার ব্যক্তিমানসের প্রকাশ ঘটে; তা না ঘটলে তাকে যথার্থ শিল্পকর্ম বলা যায় না, তা নিতান্ত ফোটোগ্রাফিতে পরিণত হয়। বিখ্যাত সমালোচক হাড্‌সন সাহেব সাহিত্যের সংজ্ঞা নির্ধারণে এই personalityর উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। কিন্তু রম্যরচনার ক্ষেত্রে এই personalityর যেন পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। তাই ইংরেজী সাহিত্যে এই ধরনের রচনাকে বলে personal essay, ফরাসী সাহিত্যে বলে Belles-lettres। রম্যরচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য। রম্যরচনার ভাষার মধ্যে দেখা যায় নিশ্চণ, কথনরীতি বুদ্ধিদীপ্ত; রম্যরচনাকার ভাষার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে পাঠক-মনকে সাময়িক ভাবে মোহগ্রস্ত করে রাখেন। রম্যরচনার মধ্যে যে হাস্যরস থাকে তা অতিনাত্রায় বুদ্ধিদীপ্ত; এ হাস্যরস নির্জলা নির্মল হাস্যরস নয়। এ হাস্যরসের মধ্যে গভীরতা রয়েছে। এ হাস্যরসের আবেদন ততখানি হৃদয়ের কাছে নয়, যতখানি মস্তিষ্কের কাছে। অর্থাৎ রম্যরচনাতে wit রয়েছে, humour নয়।

কিছুকাল আগে একশ্রেণীর সমালোচক রম্যরচনা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁরা এমন কথাও বলেছিলেন যে, রম্যরচনাকে সমাদর ক'রে পাঠক-সমাজ তরল মানসিকতার পরিচয় এবং প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এ ধরনের অভিমত আমরা গ্রহণ করতে পারি না। রম্যরচনার সমাদর তরল মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছে না, বরং এটা প্রমাণ করছে যে, আমাদের রসবোধ কতখানি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা সমালোচক সম্প্রতি রম্যরচনা সম্বন্ধে নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন—"একশ্রেণীর পাঠকের লঘুমনস্কতার সুযোগ নিয়ে, রম্যরচনা-নামধেয় কিম্ভূত সাহিত্য সৃষ্টি পাঠক-সাধারণের ঘাড়ের উপর চেপে বসতে যাচ্ছে। রম্যরচনাতে রম্যতা কতটুকু আছে বলতে পারব না, তবে চিহ্নিত লক্ষণাদির মানদণ্ডে এটি যে যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না, সে কথা জোর করে বলা চলে।" বাংলা সাহিত্যের এই প্রখ্যাত সমালোচকের অভিমত শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করে বিনীতভাবে আমরা বলব যে, এই অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত নই। আমরা অস্বীকার করি না যে, রম্যরচনা মহৎ সাহিত্য নয়। কারণ সে সাহিত্য সাময়িকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, নিত্যকালের আসন সে লাভ করতে পারে না। কিন্তু তা বলে সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে রম্যরচনাকে না ফেলার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। থাকলেও তা রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর নামান্তর, যুগোপযোগী নয়। রম্যরচনাকে সাহিত্যের

গণ্ডীর মধ্যে ফেলতেই হবে। সংবাদ-সাহিত্য, বিজ্ঞাপন-সাহিত্য যদি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে রম্যরচনা, যা নাকি সাহিত্যের একটা অপরিহার্য অঙ্গ, তাকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না করা আমাদের অনুদারতা কেবল সূচিত করে না, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতা সূচিত করে। রম্যরচনা আর যাই হোক, তার মধ্যে রম্যতা আছে এবং তা একটা সৃষ্টি। রম্যরচনা যখন রম্য এবং রচনা, তখন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত তাকে না করলে, সাহিত্যের যা সংজ্ঞা তা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রম্যরচনার বয়স খুব বেশীদিনের নয়। কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্সা ঠিক রম্যরচনা নয়, তবে রম্যরচনার প্রচেষ্টা বলা যায়। অবশ্য একে স্কেচ বলা সংগত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম রম্যরচনা হিসাবে আমরা বলতে পারি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'। তার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' 'পঞ্চভূত' ইত্যাদি। অবশ্য আধুনিক যুগেই রম্যরচনার বিশেষ প্রসার হতে আরম্ভ করেছে। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', মুজতবা আলির 'ময়ূরকণ্ঠী' 'পঞ্চতন্ত্র' 'চাচা-কাহিনী', দেবেশ দাশের 'রাজোয়ারা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক রম্য-রচনাকারদের মধ্যে, ভাস্কর, ইন্দ্রজিত, রঞ্জনের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী সাহিত্যে Lambএর রচনাগুলো (essays) বিশেষভাবে রম্যরচনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান যুগে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রম্যরচনার আদর ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা অবশ্য আমাদের রসবোধের অভাব সূচিত করে না বা বাংলা সাহিত্যের অপকর্ষের সংকেত বহন করে না। উপরন্তু এটা একান্তভাবে স্বাভাবিক, অন্ততঃ বর্তমান যুগের সংগ্রামমুখর জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে। বর্তমান যুগ প্রচণ্ড দ্রুতগামিতার যুগ। জীবন-সংগ্রামে সতত-নিরত মানুষের অবসর খুবই কম। যেটুকু অবসর পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষ সংক্ষিপ্ত অথচ লঘু কিছু পাঠ করেই তা অতিবাহিত করতে চায়। তাই তত্ত্ব বা তথ্য-পূর্ণ গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আর বৃহদাকার উপন্যাসের স্থান কালক্রমে গ্রহণ করছে রম্যরচনা। আমরা রম্যরচনার ক্রমোন্নতি কামনা করি। রম্যরচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে দেখা দিচ্ছে নিত্যনব বৈচিত্র্য, আর তার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে দেখা দিচ্ছে রূপান্তর। অতি বড় উন্নাসিক সমালোচককেও আজ কুণ্ঠাহীন চিত্তে স্বীকার করতে হবে যে রম্যরচনা সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর সব দেশের সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

শ্রীদীপ্তিপ্রসাদ মিত্র
তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

বিজ্ঞান এবং সাহিত্য

আমাদের শিক্ষাবিভাগের প্রধানতঃ দুইটি শাখা—বিজ্ঞান এবং সাহিত্য। সাধারণ দৃষ্টিতে এ দুটির মধ্যে দেখা যায় চরম বৈসাদৃশ্য। একটি হল কঠোর নিয়মের অনুগত, আর অপরটি যেন বাঁধন-ছেঁড়া মুক্ত বিহঙ্গ। বিজ্ঞান কেবল পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের মধ্যেই আছে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভাব ও কল্পনার রাজ্যে সাহিত্য স্বেচ্ছাচারী। তাই মনে হয়, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য যেন দুটি বিপরীতমুখী প্রবাহ, এদের ধর্মতঃ কোন মিল নেই।

কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখতে গেলে, বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে অনুসন্ধিৎসার মধ্যে। আমাদের মনে নিত্য যে প্রশ্ন জাগে তারই যথার্থ উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা পেয়েছি বিজ্ঞানকে। চতুষ্পার্শ্বের এই দৃশ্যমান কর্মচঞ্চল বাস্তব জগতের দিকে তাকিয়ে মানুষের কৌতূহলী মনে প্রশ্ন জাগে—'কেন'? যেমন গাছ থেকে পাকা ফল 'কেন' আকাশে না উঠে, মাটিতে পড়ে? পাথরে পাথরে ঘষা দিলে 'কেন' আগুন জ্বলে? এই-সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি বিজ্ঞানের কাছে এবং তাকে চলতে হয় বাস্তব জগতের নিয়মের মধ্য দিয়ে। চাক্ষুষ জগতের কারণ বের করতে হলে এই চাক্ষুষ জগতের সঙ্গে মিল রেখেই চলতে হবে। তাই এটা বৈজ্ঞানিকের ধর্ম। তা না হলে কেবল কল্পনার ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ালে কখনোই বিজ্ঞানসৃষ্টি সম্ভব হয় না।

এই অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায় যতই দূরে যাওয়া যায় ততই নূতন নূতন অজানা কার্য এবং তার কারণের সন্ধান মেলে। এমনিভাবে কার্য এবং কারণের রহস্যভেদ করতে করতে একদিন বৈজ্ঞানিক এসে পৌঁছে যান এমন এক নূতন জগতে, যেখানে কার্য আর লোকচক্ষুর সামনে আত্মপ্রকাশ করে না। তাকে দেখতে হয় কল্পনায়। যেমন বৈদ্যুতিক গতিকে লোকচক্ষুর সামনে আমরা কখনোই পাই না, আর পরমাণুকে (Atom) স্বীকার করে নিয়েছি কল্পনায়।

সাহিত্যের উৎস খুঁজতে গেলেও আমরা পাই 'অনুসন্ধিৎসা'। অপরের মনের ভাবকে জানতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভাষার জন্ম, এবং শেষে ভাষার মধ্যে জন্ম নিয়েছে সাহিত্য বা কাব্য। তা হলে এক দিক থেকে সাহিত্য এবং বিজ্ঞান সমধর্মী, কারণ উভয়েই জন্ম নিয়েছে জানতে চাওয়ার প্রেরণায়।

আমরা জানি, সাহিত্য মনের ক্ষুধা মেটায়—তার অর্থ, মন যা চায় তাই এনে দেয়। কিন্তু মন তো জানতেও চায়। তবে বলা যায় সাহিত্য মনকে জানায়। কিন্তু কি জানায়? এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে যে, মানুষের চার দিকে ঘিরে আছে একটি দৃশ্যময় জগৎ, তার অন্তরালে আর একটি রসময় অরূপ জগৎ ঘুমিয়ে আছে। তার সন্ধান দেওয়াই সাহিত্যের কাজ। যেমন একটি সাধারণ দৃশ্যকে কল্পনার তুলি-লেপনে যখন সাহিত্যিক তার অবগুণ্ঠিত রসমণ্ডিত রূপটি তুলে ধরেন তখনই আমরা তাকে বলি সাহিত্য। নিত্য দেখা পারিবারিক জীবনের অন্তরালে যে সৌন্দর্য লুকানো আছে, তাকে উদ্‌ঘাটন করেন ঔপন্যাসিক এবং সৃষ্টি হয় সাহিত্য। তা হলে এক কথায় সাধারণ দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে অদৃশ্য জগৎ লুকিয়ে থেকে আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে, তাকে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। এই অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধানে সাহিত্যিক যাত্রা করেন, ঠিক যেমন কার্যের কারণ অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক ছুটে চলেন অজানার পিছনে। এবারও বিজ্ঞান এবং সাহিত্য নেমে এল সমপর্যায়ে।

তা হলে জন্ম এবং কর্ম অথবা উৎস এবং উদ্দেশ্য বিচার করলে বিজ্ঞান এবং সাহিত্য সমশ্রেণীভুক্ত। কিন্তু কর্মের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। অজানার অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক যাত্রা করেন দুর্গম পথে। ভাব এবং কল্পনাকে তার পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে চলতে হয় কেবল পরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। পাছে ভাব বা কল্পনা তাঁর মনকে মোহিত করে, সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিককে সর্বদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম সংঘটনও তাঁর দৃষ্টিকে এড়াতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যের যাত্রাপথ বিপরীত দিকে। বৈজ্ঞানিক যাকে সযত্নে তার পথ থেকে অপসারিত করেন, কবি তাকেই গ্রহণ করেন পথের পাথেয়রূপে। কল্পনার নেত্র উন্মীলিত করেই তাঁকে দেখতে হয় অরূপ জগৎকে, এবং সেই অরূপ জগতে ভাব ও রস সিঞ্চন করে সৃষ্টি করেন সাহিত্য। একজনকে নদী সাঁতরে পার হতে হয়, আর একজন মাত্র লাফিয়ে ওপারে পৌছান। এইটুকুই যা পার্থক্য।

শ্রীজীবনাথ রায়চৌধুরী
চতুর্থ বর্ষ। বিজ্ঞান

যাযাবর এবং তাঁর দৃষ্টিপাত

আমি যেমন দেখেছি

বাংলা সাহিত্যের ভাব-গঙ্গার যে গতি-পরিবর্তন হচ্ছে বা হয়েছে তা আর এখন তর্কসাপেক্ষ নয়। সেটা চিন্তাশীল পাঠক সহজেই বুঝতে পারবেন, মুজতবা আলী, যাযাবর, রঞ্জন এবং জরাসন্ধ প্রভৃতির লেখার মধ্যে। এঁদের লেখার ঢঙে, বিষয়-নির্বাচনে, আধুনিক মনোভাবে আমরা সব দিক থেকে নূতনের ছোঁয়াচ পাচ্ছি। এঁদের লেখা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এঁরা সাহিত্যের জীর্ণ ধারাবাহিকতাকে মেনে নেন নি। এই নূতনের প্রতি এঁদের যে আগ্রহ তাকে সকলেই শুভদৃষ্টিতে বরণ করে নিতে পারেন নি। তাঁরা বলে থাকেন, যাযাবর, মুজতবা প্রভৃতির লেখার মধ্যে পলায়নী মনোভাবের পরিচয় আছে। তাই তাঁরা জীবনের জটিলতা, দুঃখদারিদ্র্যকে এড়িয়ে নূতন নূতন কল্পলোকের সৃষ্টি করে চলেছেন। আবার অনেকে বলে থাকেন, এঁরা বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করেই খালাস—তবে আবার ভাষার দিগ্‌দারি কেন? এরকম আরও কত কি। এ প্রসঙ্গে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সবাই জীবনকে একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন না। জীবনবোধের পার্থক্য অনুসারে সাহিত্যরচনাভঙ্গীতে বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা দেখা দেয়।

প্রকৃতি, জীবন এবং অনুভূতি, এই যদি সাহিত্যের মালমশলা হয়, তবে মুজতবা বা যাযাবরের লেখা কোনমতেই পলায়নী মনোভাবের পরিচায়ক নয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখা যাবে প্রকৃতি, জীবন এবং অনুভূতির অপূর্ব মিলন ঘটেছে এঁদের সাহিত্যে। এখানেই এঁরা কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। মুজতবা এবং যাযাবর এ কথা একান্ত ভাবেই বুঝেছেন যে, পুরাতন জীর্ণ ভাবধারাকে ভাষা এবং বাচনভঙ্গীর পোশাক পরিয়ে পাঠকের সামনে তুলে দিলেই সেটা নূতন সৃষ্টি হয় না। তাঁরা বুঝেছেন যে, আজকের শিল্পীকে নব নব বিষয়ে কল্পনা করতে হবে, নব নব রূপে সে কল্পনাকে মূর্ত করে তুলতে হবে—তবেই শিল্পসৃষ্টি জীবনশক্তির দ্রুত স্পন্দনে জীবন্ত এবং বাণীময় হয়ে উঠবে।

সাহিত্যে এঁরা নূতন পথ কেটে চলেছেন। অস্বীকার করা চলে না সাহিত্যের প্রাণবস্তু নির্ভর করে রসসৃষ্টির উপর। কিন্তু যাযাবর-মুজতবার লেখার মধ্যে সাহিত্যে বর্ণিত নবরসের কোন একটি নির্দিষ্ট রসের অভিব্যক্তি নেই। কিন্তু কোন বিশেষ রসের অভিজ্ঞাপক না হয়েও এঁদের লেখা রসিক মনের খোরাক যোগাচ্ছে। এঁদের পরিবেশিত

রসকে মিশ্ররস বলা চলে। যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র আধারকারকে যখন সর্বপ্রথম দেখতে পাই তখন তাঁর আচরণ আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে, কিন্তু যখন আধারকার এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় তাঁর বর্তমান জীবনের পটভূমিকা খুলে ফেললেন তখন পাঠক-মন করুণরসে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে—হয়তো বা দু গণ্ড বেয়ে দু ফোঁটা চোখের জল নেমে এসেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সুনন্দা দেবীর মত 'নীচের' প্রতি ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠেছে। পাঠক-মনে এক সঙ্গে এতগুলো ভাবসৃষ্টি করা অতি উঁচুদরের সাহিত্যকর্ম।

এই রসসৃষ্টির ব্যাপারে বিষয়বস্তু-নির্বাচন যেমন প্রয়োজনীয়, প্রকাশভঙ্গীর মূল্যও যথেষ্ট। ভাব এবং রূপের সার্থক সমন্বয় না ঘটলে সার্থক রসসৃষ্টি হতে পারে না। এদিক থেকে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' সার্থক সৃষ্টি। যাযাবর নিজামুদ্দিনের দরগা বর্ণনা করতে গিয়ে যে ঐতিহাসিক তথ্যটুকু পরিবেশন করেছেন তা পাঠক-মনে রেখাপাত করে। যাযাবর খুঁটিনাটি কয়েকটি ঘটনা যে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন তা ইতিহাস ছাপিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির উচ্চতর স্তরে পৌঁচেছে। সম্রাট-দুহিতা জাহানারার ক্ষুদ্র মর্মর-সমাধি বর্ণনা করতে গিয়ে, যাযাবর নিপুণ শিল্প-দক্ষতায় মোগল সাম্রাজ্যের কলঙ্কময় কাহিনীর এক বেদনাবিধুর দৃশ্যের সৃষ্টি করেছেন, আর তারই মধ্যে অচল অটল অকম্পিত দীপশিখার মত দীপ্তিময় জাহানারার চরিত্র-চিত্রটি আমাদের বিমুগ্ধ মনকে ইতিহাসের পাতা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

সাহিত্যের নানান শাখায় প্রকৃতির যে প্রভাব বাস্তববাদী অতি আধুনিক সাহিত্যিকও তা অস্বীকার করবেন না। যাযাবরের দৃষ্টিপাতে আধুনিক মনোভাব থাকলেও লেখকের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি যথেষ্ট আকর্ষণযোগ্য। কলকাতা থেকে দমদম যাওয়ার রাস্তা। সদ্যগত রজনীর সুপ্তির রেশ ধরণীর বুক থেকে তখনও নিঃশেষে মুছে যায় নি। এমন সময় যাযাবর দেখেছেন, 'আকাশে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডিত চাঁদ দূরবর্তী তরুশ্রেণীর শীর্ষে রুগ্না রমণীর নিষ্প্রভ মুখের মত দ্যুতিহীন। মিট মিট করে জ্বলছে গুটি কয়েক তারা। পথের পাশে গাছের ডালে ডালে পাখিদের কাকলি শুরু হয়ে গিয়েছে ধীরে ধীরে। দমদম বিমানঘাঁটির দূরবর্তী পাটকলের উত্তুঙ্গ চিম্‌নিটা আকাশের পটে আঁকা ছবির মত দেখা যাচ্ছে।···দূরে বারাসতের রাস্তা দিয়ে চলেছে সারিবন্দী মন্থর-গতি গরুর গাড়ি, বাতাসে ভেসে আসছে তাদের তৈল-তৃষিত চাকার ক্ষীণ আর্তনাদ।' একটা জীবন্ত ছবি ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। সেটা কত জীবন্ত, কত মধুর সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তার পর লেখক নয়াদিল্লীর কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'নয়াদিল্লীর আকাশে আছে

বৈরাগ্যের দৃষ্টি, বাতাসে আছে নিঃস্বের হতাশ্বাস, মাটিতে আছে তপস্বিনীর কাঠিন্য।··· তার পথপার্শ্বে সযত্নরোপিত তরুশ্রেণী পথচারীকে প্রসারিত করেছে ছত্রচ্ছায়া, তার শ্যামল তৃণাবৃত পার্ক বিছিয়ে দিয়েছে হরিৎ অঞ্চল, তার বহুবিচিত্র কুসুমের দল রচনা করেছে বর্ণাঢ্য ইন্দ্রজাল।' নয়াদিল্লী যাঁরা দেখেন নি তাঁরা কেমন করে অনুভব করবেন—কতখানি মমতা, কতখানি আন্তরিকতা দিয়ে আমাদের লেখক নয়াদিল্লীর আকাশ-বাতাস-মাটিকে অনুভব করেছেন ?

জীবনকে আমাদের লেখক (যাযাবর) দেখেছেন ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে। সমাজব্যবস্থার জাঁতাকলে মানুষ আজ নিষ্পেষিত—তার বুক-ফাটা আর্তনাদে বাতাস আজ বিষিয়ে উঠেছে। নিঃস্ব-রিক্ত, অনাহারে অর্ধাহারে ক্লিষ্ট মানুষের ব্যথা-বেদনাকে কোন মানুষই অস্বীকার করতে পারে না। অথচ আজ এ কথাও অস্বীকার করলে চলবে না—নিয়তির ক্রূর পরিহাসে জীবনযুদ্ধে যারা নিদারুণভাবে পরাজিত, এ সংসার যাদের কেউ নয়, যারা সংসারের শুধুই বোঝা, তাদের কথা বলতে তাদের বেদনাকে অপাংক্তেয় করে রাখলে চলবে না। তাই লেখকের চলার পথে, দুদিনের জন্য একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তার ব্যথা-বেদনাকে কত গভীর ভাবে নিবিড় করে অনুভব করছেন, সে কথা দৃষ্টিপাতের পাঠকের কাছে বলতে যাওয়াই বাতুলতা। তবু দু-একটি কথা লিখব।

চারুদত্ত আধারকার সুনন্দার কাছ থেকে নিষ্ঠুরতম আঘাত পেয়ে শেষ বারের মত লাহোর পরিত্যাগ করছেন। কিন্তু হায়, নিয়ে চলেছেন শুধু দেহখানা—শতধাবিদীর্ণ মন, সে তো পড়ে রইল লাহোরে। আমাদের লেখক লিখেছেন—'যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়, বোমার আঘাতে আহতের একটি বাহু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে অদূরে, অথচ সংজ্ঞা হয় নি বিলুপ্ত। অ্যাম্বুলেন্স-বাহিত সে আহত স্পষ্ট দেখতে পায়, ফেলে রেখে যাচ্ছে সে খণ্ডিত বাহু। আধারকার অনুভব করলেন সেই অনুভূতি। আপন চোখে দেখতে পেলেন, ফেলে রেখে যাচ্ছেন,—বাহু নয়, শতধাবিদীর্ণ হৃদয়।'

জাহানারা। হোক সে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তাঁর জীবনের যে বিরাট ট্রাজেডি তা তো আমাদের অজানা নয়। তবু যাযাবরের লেখনী-স্পর্শে তাঁর জীবননাট্যের বেদনা-বিধুর শেষ দৃশ্যগুলি করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠেছে। আসন্ন সন্ধ্যার শান্ত নিস্তব্ধতায় শ্রদ্ধানম্র চিত্তে লেখক জাহানারার সমাধিপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন। দেখেছেন, নবশ্যাম দূর্বাদল ছেয়ে আছে ক্ষুদ্র নিরলংকার সমাধি। অনুভব করেছেন, 'নির্মল নীল আকাশ থেকে প্রত্যহ নিশীথে সিঞ্চিত হয় বিন্দু বিন্দু শিশির, প্রভাতে স্পর্শ করে তরুণ

অরুণের প্রথম আলো, সন্ধ্যায় ছড়িয়ে পড়ে গোধূলি-আলোকের সোনালি আভা।' লেখকের মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে—তারা কি পায় শতাধিক বর্ষ পূর্বে সমাধিস্থ অঙ্গের সেই ললিত সুবাস, পায় তার সুকুমার বক্ষের নীচে ভক্তিগত হৃদয়ের মৃদু স্পন্দনধ্বনি?

'দৃষ্টিপাতে' যে জিনিসটা বিশেষ করে পাঠক-পাঠিকাকে আকর্ষণ করে তা হচ্ছে যাযাবরের বাচনভঙ্গী। এই জিনিসটাই সমস্ত কিছু বর্ণনার মধ্যে গতিবেগ এনে দিয়েছে। আর এরই জন্য বোধ হয় বিষয়বস্তুর মধ্যে খুব বেশী আকর্ষণীয় কিছু না থেকেও সকলের হৃদয় অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে সমস্ত বইখানার আগাগোড়া অফুরন্ত দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। আধারকার প্রকৃতই সুনন্দা ব্যানার্জিকে ভালবেসেছিলেন। আধারকারের প্রেম কোন সমর্থনের অপেক্ষা না রেখে আপন গতিবেগে বয়ে চলেছিল। কিন্তু একদিন হৃদয়হীনা সুনন্দা ব্যানার্জির নিষ্ঠুর আঘাতে সেই প্রেমের গতিবেগে পড়ল বাধা। আধারকার লাহোর থেকে বম্বে চলে এলেন। কিন্তু আধারকারের কাছে 'আকাশ আজ নিঃশেষে শূন্য, বাতাস আজ নিরর্থক, এই জনাকীর্ণ পৃথিবীর সমাজ ও সংসারের যাবতীয় কর্ম বিষাদ ও ক্লান্তি কর।'...'নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখলেন আধারকার। একটা বিরাট মরুভূমির মত সর্বত্র ঊষর, কোনখানে নেই একটু ছায়া, একটু শ্যামলিমা, একটু আলোক-আঁধার-বিজড়িত স্নিগ্ধতার চিহ্নলেশ।' বছরের পর বছর হয়েছে গত। জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় এসে পৌঁচেছেন আধারকার। দেহে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে বার্ধক্যের আক্রমণ-আভাস। হৃদয়াবেগের যে তীব্রতা যৌবনের লক্ষণ, তা আর আজ আধারকারের জীবনে নেই। আধারকার সমস্ত হৃদয় দিয়ে সুনন্দাকে ভোলার চেষ্টা করেছেন—বার্ধক্যের স্তিমিততায় হয়ত সুনন্দা অস্পষ্টতর হয়েও এসেছে। তবু কি আশ্চর্য মানুষের মন। 'ক্ষতের মূল রয়েছে গভীরে, যদিও চিহ্ন গেছে মিলিয়ে। অসাবধান মুহূর্তে ছোঁওয়া লাগলে আজও টন্ টন্ করে ব্যথায়। নিঃশেষ হয় না স্মৃতি।'

আধারকারের জীবনের কতবড় বেদনাকে যে লেখক রূপ দিয়েছেন—ভালবেসে যে বঞ্চিত হয় নি সে কেমন করে অনুভব করবে? আধারকারের জীবনে প্রেমবোধ মূল্য দিয়ে কেনা যায় না—এটা একটা প্রতিভা। তাই, ভালবাসার কণ্টকহুলে বিদ্ধ হয়ে যাদের জীবন বিষাক্ত হয়ে গেছে, তাদের প্রতিনিধি হয়ে আধারকার বলেছেন, 'মিনি সাহেব, আমি ইডিয়েটই বটে। পরিহাসকে মনে করেছি প্রেম; খেলাকে ভেবেছি সত্য। কিন্তু আমি তো একা নই। জগতে আমার মত মূর্খরাই তো জীবনকে

করেছে বিচিত্র, সুখে দুঃখে অনন্ত-মিশ্রিত। যুগে যুগে এই নির্বোধ হতভাগ্যের দল ভুল করেছে, ভালবেসেছে, তার পর সারা জীবনভোর কেঁদেছে।'

আধারকারের জীবনের যে ট্রাজেডি, তার পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখতে পাব উপসংহারের পথে। সুনন্দা ব্যানার্জি অতি সামান্যা নারী। একদিন যেমন অতর্কিতে আধারকারের জীবনে এসেছিল, তেমনি চলে গেছে। এই আসা এবং যাওয়ার মধ্যে আধারকারের জীবনে যে কি সর্বনাশের বীজ বপন করে গেল সে কথা ভেবে দেখবার বা আধারকারের জীবনের দিকে চেয়ে দেখবার প্রয়োজন সে অনুভব করে নি। কোনদিন কোন কর্মহীন ক্লান্ত অবকাশে আধারকারের কথা চিন্তা করে তার মন উন্মনা হয় কি না, সে কথা জানার উপায় নেই। 'অথচ এরই জন্য আধারকার দিলেন চরম মূল্য। নিজেকে বঞ্চিত করলেন সাফল্য থেকে, খ্যাতি থেকে, ঐহিকের সর্ববিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থেকে। সবচেয়ে বড় কথা, নিজেকে বঞ্চিত করলেন সন্তবপর উত্তরপুরুষ থেকে, বংশের ধারাকে করলেন বিলুপ্ত।'

এ জগতে আধারকারের আপন বলতে আর কেউ রইল না। সুনন্দা ব্যানার্জির মত নির্ভরযোগ্য আশ্রয় আধারকারের জীবনে আর ছিল না। আর হঠাৎ একদিন যখন সেই নির্ভরযোগ্য আশ্রয় পায়ের তলা থেকে সরে গেল, তখন আধারকার নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করলে—'এক্‌ঠো রুম্‌লীন। একটা টাম্‌লারে আধেকটা বরফের টুকরো, কিছুটা ক্রেক্‌স্টাইল ভারমুথ, একটা ড্রাইটিন। আচ্ছা করে মেরে দু ফোঁটা অরেঞ্জ বিটার্সের' মধ্যে। এটাই তো স্বাভাবিক। জীবনের অস্তিত্বকে যারা ভুলে থাকতে চান তাদের পক্ষে এর থেকে নির্ভরযোগ্য আশ্রয় আর কি আছে।

এই শেষ নয়। এমন করে জীবনকে যে শেষ করে দিতে চায় পাঠক-পাঠিকা ছাড়া তাঁর জন্য দু ফোঁটা চোখের জল ফেলার মত এ জগতে আর কেউ নেই। তাই আমাদের লেখক দরদী মরমী কণ্ঠে বলেছেন, 'কোনদিন কোন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর সুশীল কামনা করে তুলসীমঞ্চে কেউ জ্বালবে না দীপ, কোন নারী সীমন্তে ধরবে না তাঁর কল্যাণ-কামনায় সিন্দুর-চিহ্ন, প্রবাসে অদর্শন-বেদনায় কোন চিত্ত হবে না উদাস উতল। রোগশয্যায় ললাটে ঘটবে না কারো উদ্বেগকাতর হস্তের সুখস্পর্শ, কোন কপোল থেকে গড়িয়ে পড়বে না নয়নের উদ্বেল অশ্রুবিন্দু—সংসার থেকে যেদিন হবেন অপসৃত, কোন পীড়িত হৃদয়ে বাজবে না এতটুকু ব্যথা, কোন মনে রইবে না ক্ষীণতম স্মৃতি।'

সাহিত্যের দরবারে 'যাযাবর' এবং তাঁর 'দৃষ্টিপাত' মস্তবড় একটা আসন দাবি

করেন না বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অগণিত অনুরাগীর হৃদয়ে এঁরা যে আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন, তা নিয়ে এখন আর সমালোচকদের দুঃখ করে লাভ হবে না। সমালোচকের যে ভাষা—'আবেগসঞ্জাত মোহ'—তা দিয়ে আমরা দৃষ্টিপাত এবং যাযাবরকে দেখলেও—আমাদের মোহ যখন অপসারিত হবে তখন কি চোখে এঁদের দেখব সে কথা এখন মুলতুবি থাক।

শ্রীঅনল মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ। কলা

বিদায়ী বর্ষ

বড়দিনের ছুটিতে রাঁচীতে গিয়েছিলাম। বছরের শেষ ক'টা দিন মামা-মামীমার কাছে আমোদ করে কাটানো যাবে, রাঁচী শহরটাও একটু ঘুরেফিরে বেড়ানো যাবে, এই ছিল মতলব। ২৮ তারিখে রাত্রে হঠাৎ স্থির হল যে, মামার মোটরে করে আমরা সোজা জামুই যাব। সেখানে বড়মামা থাকেন। যা স্থির করা হল কাজে তা করবার সময়ে কিছু না কিছু গোলমাল হওয়াই স্বাভাবিক। তাড়াহুড়োতে পড়ে রইল অনেক কিছু। মামার তাড়াহুড়ো ও তাগাদার চোটে গাড়িতে উঠবার সময়ে দুর্গা-নাম নিতেও ভুলে গিয়েছিলাম বোধ করি।

হাজারীবাগ রোড ধরে গাড়ি চলল। বাবা, আমি, ছোটমামা, মামীমা আর ছোট্ট গার্গী ও রাজু, এই আরোহী; আর আমাদের ড্রাইভার—রথের সারথী মন্দ নয় নেহাৎ, তবে অভাব কেবল তার চালনা-নৈপুণ্যের। কিছুক্ষণ পূর্বেই প্রবল শিলাবৃষ্টি হয়ে যাওয়ার দরুন পথ আমাদের শিলাখণ্ড আর স্তূপীকৃত ঝরা পাতায় সমাচ্ছন্ন। দূরে কুয়াশার মত দেখে মামা তাঁর স্খলিত হিন্দীভাষার পরিচয় দিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি সুনুদ্দুর হ্যায় নাকি?' উত্তর দিতে গিয়ে ড্রাইভারের স্টীয়ারিং সবল আন্দোলিত হল। বাবা শশব্যস্তে বললেন, 'আরে আরে, তুম্ অপ্না স্টীয়ারিং ঠিক রাখো ভাইয়া, নইলে ভবসুনুদ্দুর পার হোনে দেরি নেই হোগা।'

নানারকম গল্পগুজব ও হাসির মধ্যে এসে পড়লাম রামগড়ে। এখানে গরম চা ও মুখরোচক আলুর চপ দিয়ে জলন্ত উদর-দেবের খাসা তর্পণ করা গেল। তার পর আবার যাত্রা হল শুরু। ড্রাইভার ঠিকই যাচ্ছিল, হঠাৎ মামা চীৎকার করে উঠলেন, 'আরে আরে, কাঁহা যাতা হ্যায়? ইস্ রাস্তা নেই, উস্ রাস্তা সে চলো।' প্রভুর আদেশে ভিন্ন মার্গ ধরে চলল আমাদের রথ, এবং তার পরেই হেড্‌লাইটের তীব্র আলোয় দেখলাম যে, সামনের পথ আর দেখা যাচ্ছে না, তার পরিবর্তে আমাদের ভীত ও বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বিরাট খরস্রোত পাহাড়ি দামোদর, এবং গাড়ি এসে থামল এক জনমানবহীন শ্মশানঘাটে।

বুঝলাম ভুল পথে এসেছি। গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে ঝপাং করে গাড়ির পিছনের চাকা দুটো গিয়ে পড়ল খাদের মধ্যে। অ্যাঁ! তবে মৃত্যুর কবলে? তবে আর দুর্গানাম করে কি হবে?

গাড়ি থেকে নেমে আমরা সবাই মিলে আপ্রাণ শক্তিতে হেইও হেইও করে গাড়িটাকে ঠেলাঠেলি করলাম, কিন্তু গাড়ি আমাদের সম্মিলিত ঝাঁকুনিকে উপেক্ষা করে নির্বিকার চিত্তে বসে রইল, অগত্যা মামা আমি ও ড্রাইভার লোকজন যোগাড় করে নিয়ে এলাম এবং গাড়ি উদ্ধার হল। প্রণাম জানালাম ভগবানকে, বোধ হয় খুব কমই এত ভক্তিভরে প্রণাম করি। আর প্রণাম জানালাম দামোদরের তীরের সেই নাম-না-জানা শ্মশানের বিদেহী অতৃপ্ত আত্মাদের উদ্দেশে, যাদের আকর্ষণে এগিয়ে গিয়েছিলাম অতটা দূর। তার পরে আবার রওনা হলাম হাজারীবাগের পথে।

হাজারীবাগে পৌছলাম রাত সাড়ে-দশটার সময়ে। ডাকবাংলো বা ইন্‌স্পেক্‌শন্ বাংলো কোনটাতেই জায়গা পেলাম না একটুও। বাধ্য হয়ে গাড়ির ভিতর মামীমা, গার্গী ও রাজুকে নিয়ে রাত কাটালেন এবং বাংলোর বারান্দায় আমি বাবা ও মামা অর্ধজাগ্রত অবস্থায় রাত কাটালাম।

সকাল বেলায় হাজারীবাগ ছাড়লাম। চললাম কোডারমার পথে। পথে তিলাইয়া বাঁধ দেখলাম। আধুনিক যান্ত্রিক যুগের অবদান এই বাঁধ। প্রবল জলস্রোত রোধ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি যন্ত্র নিজের নিজের সুনির্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে অসাধারণ ক্ষিপ্রগতিতে। দেখলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। বাঁধের উপর থেকে দেখলাম দামোদরকে, দেখে আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। একদিকে সেই সনাতন দামোদর তার নিজস্ব সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে, আর একদিকে ১৭ মাইল চওড়া বিরাট জলরাশি। নীল জল—যতদূর দৃষ্টি যায় ছোট ছোট ঢেউগুলি সূর্যকিরণে যেন সোনালি মুকুট পরে চঞ্চলগতিতে ছুটোছুটি করছে, আর দূরদিগন্তরেখায় আকাশ আর জল—দুটি নীলিমার মিতালি।

কোডারমার অভ্র-ছড়ানো পথে আবার শুরু হল যাত্রা। কোডারমা স্টেশনে বাবা নেমে গেলেন কলকাতার গাড়ি ধরবেন বলে। আমরা তাঁকে নামিয়ে দিয়ে নওয়াদার পথে পাড়ি দিলাম। পাহাড়ি পথে চড়াই ও উৎরাইতে গাড়ি উঠতে নামতে লাগল—গাছপালার আড়ালে বিদায়ী সূর্য তার শেষ আশীর্বাদের মত সোনালি আভাটুকু পাহাড়ের শিখরে মাখিয়ে সন্ধ্যাকে আহ্বান জানাল। লালে লাল হয়ে উঠল পশ্চিমাকাশ। 'পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন'—মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের বাণী।

'নওদা'তে পৌছে বেশ ভাল ব্যবস্থা পেলাম ওখানকার ইন্‌স্পেক্‌শন বাংলোতে। রাতটায় স্থানীয় একটা দোকানে নানারকম মিষ্টি, লুচি আর তরকারি দিয়ে উদরপূর্তি

করলাম, তার পর এমন ঘুমোলাম সে রাত্রে যে স্বয়ং কুম্ভকর্ণ যদি এ যুগে জন্মাতেন তবে তিনিও তারিফ করতেন সন্দেহ নেই।

ভোরে উঠেই আবার জামুইএর পথে। তখন মাঠের শেষে দিক্‌চক্রবালরেখায় সূর্যের আগমনীর সূচনা হয়েছে। ধীরে ধীরে দেখা দিল হাস্যময়ী উষা, ধরার বুকে ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি। পথ ভরে উঠল শিশিরসিক্ত সবুজ ক্ষেতের তাজা মিষ্টি গন্ধে আর প্রভাতী পাখির কাকলিতে।

জামুইতে পৌছতে তখনও মাইল আষ্টেক বাকি আছে—ছোটমামা মতলব করলেন, কাছাকাছি কোন একটা জায়গায় প্রাতরাশ সেরে নেওয়া হবে। 'মহাদেও সিমারিয়া' বলে একটা ছোট গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। চা-পানের উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে নামতেই চারদিকে রথযাত্রার ভীড় সৃষ্টি করল কৌতূহলী গ্রামবাসীগণ। এবং সর্বোপরি যখন চশমা-পরিহিতা মামীমা গায়ে ওভারকোট চড়িয়ে গাড়ি থেকে নামলেন তখন আবালবৃদ্ধবনিতা ভেঙে পড়ল আমাদের চারদিকে। যেখানেই যাই, পেছনে বিরাট জনতা। কাছেই মহাদেবের একটা মন্দির দেখে তার ভেতরে ঢুকে পড়ে এই পশ্চাদনুসরণকারী জনসমুদ্রের হাত থেকে রেহাই পাবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু কোথায় পরিত্রাণ? সামনে মৃতদেহ বহন করে একটি শববাত্রা আসছিল, মেয়েরা দরবিগলিত নেত্রে শোকাকুলহৃদয়ে শবের অনুগামিনী, হঠাৎ আমাদের ওপর নজর পড়তেই তাদের অশ্রু গেল শুকিয়ে, কৌতুকের অদম্য আগ্রহ ঢেকে দিল শোকের উপর আবরণ, এবং মৃতদেহটিকে পথিপার্শ্বে রেখে স্বচ্ছন্দচিত্তে তারা সকলে আমাদের অনুসরণ করতে আরম্ভ করে দিল। হায় রে, আমাদের যে এত দাম তা যদি সবাই জানত।

জামুই পৌছলাম ঘণ্টাখানেক পরেই। সে দিনটায় বিশ্রাম করে বিকেলবেলায় ওখানকার 'কিউল' নদীর তীরে একটু ঘুরে এলাম। নদীতটে এক সাধু দিনান্তে তার অন্নগ্রহণ করছিল, তার সঙ্গেও একটু আলাপ করেছিলাম। সে গঙ্গাসাগর-তীর্থে যাচ্ছে, পায়ে হেঁটেই। তার নিরুদ্বেগ প্রশান্ত জীবনযাত্রা দেখে জীবনের উপর লোভ আর রইল না আমার।

পরদিন অপেক্ষাকৃত দলে ভারী হয়ে (কারণ এবার বড়মামা, বড়মামীমা ও তাঁদের ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে ছিলেন) আমরা মুঙ্গের রওনা হলাম। মুঙ্গের থেকে ১৮ মাইল দূরে গৈবীনাথ, সেখানেই প্রথম গেলাম। গঙ্গার সুবিস্তীর্ণ জলরাশির মাঝে একটি পাহাড়, তার উপরে মহাদেবের মন্দির—এই গৈবীনাথ।

চারদিকে গঙ্গার সহস্র শীতল বাহুলতার আলিঙ্গনে বদ্ধ গঙ্গার প্রিয়তম শঙ্কর। কোন্ স্মরণাতীত কালের, না জানি কোন্ পুণ্যাত্মার পরিকল্পিত এই দেবালয়, প্রকৃতির শান্ত সুগম্ভীর পরিবেশে গঙ্গার বিশাল বুকে এই দেবধাম দেখে অবাক বিস্ময়ে ও মুগ্ধ অপলক নয়নে তাকিয়ে রইলাম। সর্বত্যাগী তপস্বী মহাশিবের অনুসরণে যেন গঙ্গার গৈরিক জলরাশিতে চারদিকেই বৈরাগ্যের ছবি আঁকা। উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে অনন্ত জলরাশি, আর তার মাঝে এই পবিত্র গৈবীনাথ। একদিন মহাশক্তির চরণে লুটিয়ে প'ড়ে, হে সর্বংসহ শিব, তুমি দলিত হয়েছিলে, আজ তাই বুঝি সহস্রযুগযুগান্তর ধরে চলছে সতীর প্রায়শ্চিত্ত, তোমার চরণের প্রতি ধূলিকণা নিঃশেষে ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে গঙ্গা—অনুতপ্তা জগন্মাতার প্রতিনিধি হয়ে।

মন্দিরে সর্বপ্রথম প্রণাম করলাম দেবজনকজননী হরপার্বতীকে। হৃদয়ে ভক্তির উৎস আমার নেই, নাস্তিক বলেও অখ্যাতি আমার আছে, তবু কেন আজ এ মহিমময় রূপের কাছে আপনা-আপনি মাথা নত হয়ে এল আমার? শ্মশানের ধূলির বিভূতি যাঁর চন্দনের পত্রলেখা, স্বচ্ছন্দবনজাত আকন্দ ধুতুরা যাঁর প্রস্ফুটিত কমলের অর্ঘ্য, সকলের অবহেলায় বর্জিত পদ যাঁর বরণীয়, সেই পরমযোগী শঙ্কর—এ বুঝি তোমারি দান, আমার নাস্তিক অবিশ্বাসী মনকে তুমি আপ্লুত করে দিয়েছ তোমার দেবত্বের অনির্বচনীয় মহিমায়!

গৈবীনাথের পর এল মুঙ্গের-ভ্রমণের পালা। মুঙ্গের জায়গাটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। দেখবার অবশ্য তেমন কিছু নেই, এক গঙ্গা ছাড়া। গঙ্গার বিশাল অথচ শান্ত স্নিগ্ধ রূপ মনকে সত্যিই মুগ্ধ করে। গঙ্গার অনতিদূরে একটি ছোট সুড়ঙ্গ নজরে পড়ল, শুনলাম মীরকাসেম নবাব এই পথে আত্মগোপন করে চলে গিয়েছিলেন। হয়তো ইতিহাসের পাতায় এ সুড়ঙ্গটির কোনই দাম নেই। কিন্তু আমার মনে এ সুড়ঙ্গটি যেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত ঐতিহাসিক সম্পদ হয়ে ফুটে উঠল। নবাব মীরকাসেমের পায়ের ধুলো মিশে আছে এই সুড়ঙ্গের মাটিতে। এর কি দাম কম? দেশভক্ত সন্তান মীরকাসেম, তুমি ভালোবেসেছিলে দেশের মাটিকে, জাতিধর্ম ইত্যাদির কোন বাধা তোমার মনে ঠাঁই পায় নি। হায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব, তোমার মহাপ্রস্থানের পথ এ কি অবহেলায় রয়েছে? তুমি জেলেছিলে একটি ছোট প্রদীপ, স্বাধীনতার ছোট্ট আলো—বিদেশী ঝড়ে নিভে গেল সেই দীপ। তোমায় স্মরণ করে প্রণাম জানাই।

মুঙ্গেরে গঙ্গার কোলে চণ্ডীস্থান। কথিত আছে এখানে মহাকালের প্রলয়নাচনের সময় মহাসতীর চোখ পড়েছিল। এখানে একটি ঘাট আমার স্বর্গত পবিত্রচেতা মাতামহ

প্রতিষ্ঠা করেন। আজো তাঁর নাম লেখা রয়েছে দেখলাম। তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম।

তার পর প্রত্যাবর্তনের পালা। সেই পুরোনো পথের পথিক আমরা—যে পথে গিয়েছিলাম, সেই পথেই ফিরে এলাম।

মাথার উপরে শুক্লপক্ষের চাঁদ হাসছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কলকাতার গাড়ি ধরলাম রামগড় স্টেশনে। মামা মামীমা বিদায় নিয়ে রাঁচী রওনা হলেন।

বছরের শেষ দিনগুলি মন্দ কাটল না, বিদায়ী বর্ষের বিদায়-সম্বর্ধনাটা নেহাৎ মন্দ হয় নি। ছবির মত ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভাসছে। মামীমার যত্নের কথা মনে আসছে। ট্রেনে বসে উদাসনয়নে বাইরের পানে চেয়ে আছি। জামুইতে ক্ষণিকের জন্য দেখা-হওয়া সেই অপরিচিত সাধু কতদূর চলে গেছে কে জানে।

শ্রীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দীঘায় একদিন

এ বছর পুজার ছুটিতে কোথাও বেড়াবার সুযোগ হয় নি। তাই বড়দিনের ছুটিটাকে উপভোগ করার ইচ্ছা আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল। গতানুগতিকতার মধ্য থেকে একটু মুক্তি—একটু উদ্দাম অনাবিল আনন্দ উপভোগের প্রেরণা সেই আদিম যুগ থেকেই প্রত্যেক মানুষের মনে রয়ে গেছে। আমাদের আশুতোষ কলেজ নিউ হোস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে এবারে নূতন কোন দূর-পাল্লার পিকনিকে যাবার প্রসঙ্গ অধীক্ষক নীরদকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়কে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হল। এখন আসল কথা হচ্ছে স্থান-নির্বাচন। সর্বসম্মতিক্রমে মেদিনীপুরের সুদূর প্রান্তের সমুদ্র-উপকূল দীঘাই সেই ঈপ্সিত স্থান বলে নির্ধারিত হল। এ খবর কলেজে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। অনেকে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলেন না যে কি করে এতগুলি ছেলে নিয়ে দেড় শ' মাইল দূরে পাড়ি জমানো সম্ভব হবে। ক্রমে তাঁদের মত বদলে গেল—যাঁরা প্রথমে এটাকে শুধু কল্পনা বলে মনে করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁরাই এটাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। দিন স্থির হল। এবার উদ্যোগপর্ব।

বড়দিনের ছুটি পড়তে তখনো অনেকদিন বাকি। দীঘা-যাত্রার রোমান্স্ যেন আমাদের পেয়ে বসেছে। প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে মুক্ত প্রকৃতির বিস্তৃত বক্ষে বিচরণ করার নেশায় আমরা যেন পাগল—মুক্তির আনন্দে মশগুল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে চলেছে অনাগতকে নিয়ে কত রঙীন জল্পনা-কল্পনা। তার পর সেই শুভ মুহূর্ত এগিয়ে এল। গত ৬ই পৌষ দুপুর বেলায় আমরা অধ্যাপকদের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে রওনা হলাম। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহাধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ সরকার, অধীক্ষক শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য, ডাঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীল সিদ্ধান্ত, শ্রীকান্তীশ মাইতি, শ্রীপরিমল কর, শ্রীশিশির দাস ও শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দকে আমরা সঙ্গে পেয়েছিলাম। আগে হতেই স্টেশনে আমাদের জন্য পাশাপাশি ছুটি কামরা রিজার্ভ করা ছিল—একটি অধ্যাপকদের জন্য ও আর একটি আমাদের। আমাদের সঙ্গে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের অতিথি হিসাবে যোগ দেবার কথা ছিল। বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারলেন না। তাঁর সাহচর্য না পেয়ে আমাদের আনন্দের একটি দিক একটু অপূর্ণ রয়ে গেল।

আমরা পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। গাড়ি ঠিক সময়ে ছাড়ল। প্রতি মুহূর্তে আমাদের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় ও আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে আনন্দের ঢেউ একটির পর একটি লুটিয়ে পড়তে লাগল।

ট্রেন চলছে। চারদিকের দ্রুত-অপসৃয়মাণ গাছপালা, শস্যরিক্ত মাঠ, স্টেশনের টুংঠাং শব্দ, সব কিছু মিলে আমাদের মনে এক অপূর্ব সৌন্দর্যজগতের সৃষ্টি হচ্ছে। এ-সবের মধ্যে ক্ষুধাতুর মন তার আপন খাদ্য বেশিক্ষণ সংগ্রহ করতে পারল না—দীঘার চিন্তায় আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। ট্রেনের গতি মনে হচ্ছে বেশ মন্থর, মনের দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। দেখতে দেখতে 'মেচাদা' স্টেশন এসে গেল। গাড়ি থামল। সবাই চা খেতে নামলাম। অধ্যাপক-মহোদয়রাও নামলেন। চা-পান ও আলাপ-আলোচনার ফাঁকে অধ্যাপক ও ছাত্রদের হোস্টেলের প্রাক্তন আবাসিক শ্রীদুলাল দাস তাঁর ক্যামেরায় ধরে রাখলেন। চা-পর্ব শেষ হল। ট্রেনের সিগ্‌ন্যাল নামল। আমরা নির্দিষ্ট কামরায় উঠে বসলাম। আবার সেই একটানা চলা। এই একটানা চলা অধ্যাপকদেরও বিরক্তিজনক হয়ে উঠছিল। এতক্ষণ একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। পথের দূরত্বের কথা চিন্তা করে আমরা হোস্টেল থেকেই খাবার সঙ্গে নিয়েছিলাম। আর খাবারের ঝুড়িটা আমাদের কামরায় ছিল। একটা স্টেশনে গাড়ি থামতে অধ্যাপকদের অনেকে আমাদের কামরায় উঠে এলেন। খাবারের মধুর মদির গন্ধ যে তাঁদের বিভ্রান্ত করেছিল এ কথা বলছি না—তবে আমাদের হৈচৈএর মধ্যে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়ে তাঁদের ফেলে-আসা সেই অতীতের উচ্ছ্বাসপূর্ণ জীবনকে ক্ষণিক ফিরে পেতে চেয়েছিলেন।

ট্রেন খড়গপুরে পৌছল। সন্ধ্যা নামল। যাযাবরের মত আমরা বিছানাপত্র নিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হলাম। বাস যাত্রী নিয়ে একটু পরে ছাড়ল। খড়গপুর থেকে কন্টাই রোড ধরে আমরা কাঁথির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। খড়গপুর থেকে কন্টাই রোড পর্যন্ত রাস্তাটা খুব ভাল নয়। বাকি রাস্তাটা পীচ-ঢালা। আমরা যে বাসে উঠেছিলাম সেটা কলকাতার বাসের তুলনায় ছোট। কোনমতে সকলের তাতে স্থান সঙ্কুলান হল। বাসের ঝাঁকুনিতে আমাদের আনন্দ যেন অর্ধেক স্তিমিত হয়ে গেল। কিন্তু সে বেশিক্ষণের জন্য নয়। এতক্ষণে অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। চারদিকের গাছপালা আবছা আবছা চেনা যাচ্ছে। আকাশের চাঁদোয়ার নীচে জোনাকিরা আলোর ফুলঝুরি জ্বালিয়ে দিয়েছে। চারদিকে থম্‌থমে ভাব। এগিয়ে যাবার তালে তালে আমাদের স্তিমিত মন আবার উদ্দাম-চঞ্চল হয়ে

উঠল। কলকণ্ঠে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমরা গান ধরলাম। যতই কাঁথির নিকটবর্তী হচ্ছি ততই পথের শ্রমকে তুচ্ছ মনে হতে লাগল। বাস সাড়ে ন'টায় কাঁথি পৌছল। আমাদের মাননীয় অধ্যাপক ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও কাঁথি কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুশেখর পণ্ডা মহাশয় আমাদের জন্য কাঁথি ক্লাবের দোতলা ঘরে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, আমরা সেখানে উঠলাম। অধ্যাপকগণ কাঁথির জনপ্রিয় ভূস্বামী শ্রীসতীশ জানা ও প্রাক্তন আবাসিক শ্রীহরিশ জানা মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে তাঁদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আমরা স্থানীয় হোটেলে আহার সমাধা করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় ঘুম। নিদ্রাদেবী ভয়ে আগে থেকেই স্থান-ছাড়া হয়েছেন।

সকাল সাড়ে পাঁচটায় দীঘার বাস ছাড়ে। ভোর না হতেই বিছানা ছাড়ার তাগিদ—তার পর বাঁধাছাঁদার পালা। আমরা দীঘাগামী বাসে উঠে বসলাম। বাস ঠিক সময়ে ছাড়ল। কিছুক্ষণ পরে বাস পিছাবনী ঘাটে পৌছল। এখানে যাত্রীদের বাস থেকে নামতে হয়, কারণ রাস্তার মাঝামাঝি একটা বড় খাল চলে গেছে। খালের উপরে কোন 'ব্রিজ' নেই। একটু পরে একটা বড় নৌকার উপর বাসটাকে তুলে ওপারে পৌছে দিল ঘাটের মালিক। এই পিছাবনীর একটা ইতিহাস আছে। ১৯৩১ সালের লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে এখানকার অধিবাসীদের দান অনেকখানি। তা ছাড়া এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অত্যন্ত মনোরম।

ক্রমে দীঘার নিকটবর্তী হতে লাগলাম। সী-ডাইক দেখা গেল। মাইল-স্টোনে আর মাত্র এক মাইল। দীঘার বিস্তৃত পাইনবীথির শীর্ষরেখা দেখা যাচ্ছে। ভাবছি হয়তো কি অদ্ভুত দৃশ্যই না এখনি চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

বাস দীঘায় পৌছল। দীঘায় আমাদের জন্য তিনখানা ঘর ঠিক করা ছিল—একখানা আমাদের, বাকি দুখানা অধ্যাপকদের জন্য। বাস থেকে নামবার আগেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত সুবিশাল মহাসমুদ্র। যে দিকে তাকাই, শুধু নীল আর নীল জলরাশি। মহাসমুদ্র ধ্যানমগ্ন তাপসের মত অটল গাম্ভীর্য নিয়ে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। সাগরের কল্লোলধ্বনি আমাদের প্রাণে নূতন ছন্দের সুর জাগিয়ে তুলল। কোনমতে বাস থেকে নেমে বিছানাপত্র ঘরের মেঝেয় ফেলে অসীম আগ্রহে ছুটে গেলাম সাগর-বেলার দিকে। কি বিশাল তার বিস্তৃতি। এই দূর দিগন্তে নিঃসীম নীলিমা মহাসাগরের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। আমরা জলে নেমে গেলাম। ছোট বড় কত ঢেউ মাথায় ফেনার শুভ্র কিরীট পরে আমাদের সঙ্গে

১। পিছাবনিঘাটে পত্রিকাধ্যক্ষ

২। মেচাদা স্টেশনে

৩। দীঘার সমুদ্র

৪। পিছাবনি ঘাট

৫। কাঁথিতে ক্রিকেট খেলার পরে

আলোকচিত্রশিল্পী-দুলাল দাস

দীঘা

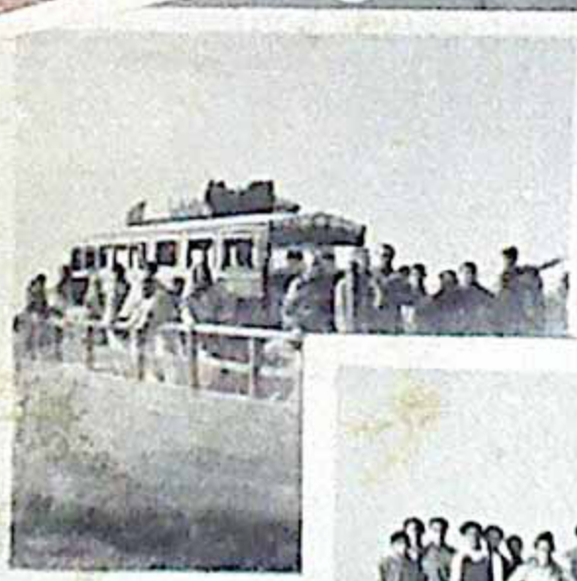

৬। দীঘার সমুদ্রে

দীঘার সমুদ্রোপকূলে

সূর্যাস্ত

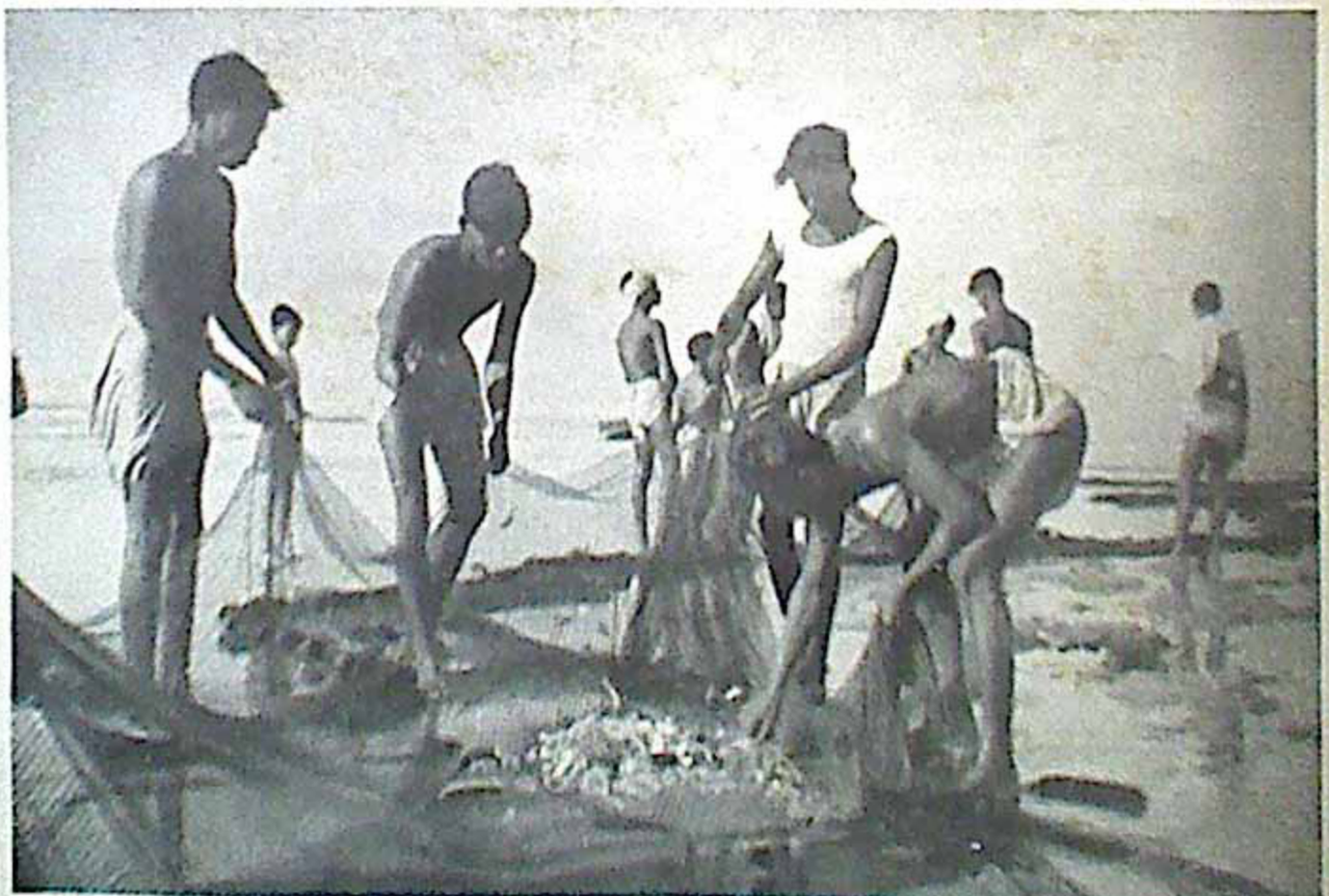

পত্রিকাধ্যক্ষের সৌজন্যে

মাছ ধরা

আলাপ করার ছলে একবার এগিয়ে আসছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। অপরিচিতের জড়তা বুঝি আর কাটে না। কবির ভাষায় বলতে গেলে—

"মুক্তা-ঘেরা ঘোম্‌টা তুলে চোখ মেলে যেই তারা
ভেঙে পড়ে বেলোয়ারী ঢেউ—ফটিক-ফেনার পারা।"

তার পর প্রাতরাশ খেতে আমরা চলে এলাম। মন কিন্তু পড়ে রইল সেখানে। সমুদ্রের মোহ সব সময় আমাদের আকর্ষণ করছে। সবাই মিলে চললাম স্নান করতে। এবার ঊর্মি-চঞ্চল মহাসমুদ্র অবিশ্রাম কলরবে তার কত কথাই না আমাদের শুনিয়ে গেল—যার আদিও নেই, শেষও নেই। স্নান শেষ করে বাসায় ফিরে এলাম। অধ্যাপকদের নিয়ে আমরা আহারে বসলাম। মাননীয় অধ্যক্ষমহাশয় লঘু পরিহাসের বন্যায় মধ্যাহ্নভোজনের আসরকে মনোরম ও উপভোগ্য করে তুললেন।

মধ্যাহ্নের সূর্য তার প্রখরতা হারিয়ে পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছে। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আমরা বেড়াতে বেরিয়ে গেলাম। দূরে উঁচু বালির পাহাড় বিকালের সোনালী রোদে ঝিক্‌মিক্ করে হাসছে—মুক্ত প্রকৃতির বুকে তাদের প্রাণের উল্লাস দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। দীঘার রিজার্ভ ফরেস্ট, কাজুগাছ, নাড়াজোল রাজার নয়নাভিরাম শৌখীন প্রাসাদ ও স্মিথ সাহেবের বাংলো দর্শক-সাধারণের মন আকর্ষণ না করে পারে না। বেলা পড়ে আসছে। সূর্যাস্ত দেখতে সমুদ্রসৈকতে আমরা রওনা হলাম। সমুদ্রে জেলেরা জাল টেনে মাছ ধরছে। তখন একদল জেলে জাল টেনে ডাঙায় তুলেছে—আমরা মাছ দেখতে গেলাম। হরেক রকমের সামুদ্রিক মাছ—ক-টারই বা নাম জানি। দেখতে দেখতে পশ্চিমের আকাশে পাল-তোলা মেঘে কে যেন মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে গেল। দূরের ঝাউ-কুঞ্জের মর্মরধ্বনি বাতাসে ভেসে আসছে। সূর্যদেব ধীরে ধীরে দিগ্বলয়-রেখার নীচে নামতে লাগলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সীমাহীন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে এক রহস্য থেকে ভিন্ন রহস্যের মধ্য দিয়ে আর এক অজানা লোকে আমরা নিজেদের নিঃশেষে হারিয়ে ফেললাম। কি অদ্ভুত প্রশান্তি!

সন্ধ্যা নামল। বাসায় ফিরে এলাম। আবার রাত্রে ভোজনের আর এক পর্ব। পথের শ্রম, ভ্রমণের ক্লান্তি আমাদের নিদ্রাদেবীর কোলে আকর্ষণ করছে। প্রকৃতি-দেবী সুপ্তির কোলে শায়িতা। নিবিড় ঘন অন্ধকারে চারদিক ঢেকে রয়েছে। দূর হতে মহাসাগরের সুগম্ভীর কল্লোল তার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে—মন উতলা। কি অপূর্ব সৌন্দর্যের ভাণ্ডার আমাদের সামনে উন্মুক্ত।

ভোর হয়ে এল। সূর্যোদয় দেখার জন্য সবাই উদ্‌ভ্রান্তভাবে সৈকতে ছুটে চলেছি।

অধ্যাপকগণও আমাদের সঙ্গ নিয়েছেন। আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল—সূর্যোদয় ভাল দেখা গেল না। ছোট ছোট জেলে ডিঙিগুলো পাল তুলে নাম-না-জানার দেশে পাড়ি দিচ্ছে। স্নাইপের ঝাঁক ঘুরে ঘুরে আকাশে উড়ছে। বালুবেলায় রাতের ঢেউ তাদের আসা-যাওয়ার স্বাক্ষর রেখে গেছে—এখনও মুছে যায় নি। সবাই মিলে ঝিনুক কুড়োতে লাগলাম—কেউ লাল, কেউ বা নীল—হরেক রকমের। প্রকৃতিদেবীর খেয়ালের এ এক অপূর্ব স্বাক্ষর।

হাতে সময় নেই—আজই সকালবেলা ফিরে যেতে হবে। মন যেতে চায় না। একটু পরে সবাই প্রাতরাশ সেরে কাঁথিগামী বাসে উঠে বসলাম। এইদিন বিকাল-বেলা কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে আমাদের প্রীতিসম্মেলন হল। খেলায় তাদের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও শেষ পর্যন্ত ভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হলেন—আমরা জয়ী হলাম। কাঁথি কলেজের ছাত্ররা আমাদের আদর-অভ্যর্থনার এতটুকুও ত্রুটি রাখে নি। তাঁদের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার আমাদের চিরদিন মনে থাকবে। সর্বজনপ্রিয় দেশহিতৈষী ভূস্বামী শ্রীসতীশচন্দ্র জানা ও শ্রীসতীশচন্দ্র দিন্দা আমাদের অকৃপণ আতিথ্য দিয়েছেন। কাঁথি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর পণ্ডা ও তাঁর পরিচালিত C. O. T. O-র কাছেও আমরা ঋণী। এঁদের সকলের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রাক্তন আবাসিক শ্রীদুলাল দাস তাঁর প্রীতিমধুর সাহচর্য ও লঘুতরল পরিহাসের মাধ্যমে আমাদের এই ভ্রমণকে সুখকর করে তুলেছিলেন—তাঁকেও ভুলবার নয়। সর্বশেষে আমাদের অধীক্ষকমহাশয় ও ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের কথা না বললে অনেক কিছুই বাকি থেকে যায়। এই সুদীর্ঘ যাত্রায় তাঁরাই একমাত্র কর্ণধার। তাঁদের সুচিন্তিত উপদেশ ও অকৃত্রিম অনুপ্রেরণা আমাদের এই দীঘা-ভ্রমণকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছে। সেদিনটা কাটল কাঁথিতে—কাঁথির কলেজে, খেলার মাঠে, বীরেন্দ্র শাসমল স্মৃতিসৌধে, আরও কত কি দেখতে দেখতে। রাত্রে কাঁথিতে বিশ্রাম।

তার পরদিন সকালবেলা খেয়ে দেয়ে কলকাতার পথে রওনা হলাম। শরীর ও মন দুইই বেশ ভারাক্রান্ত। তবে নিরাশার মধ্যে আশা—এ ক'দিনের অধ্যাপকদের নিকট সান্নিধ্য ও সাহচর্যের উজ্জ্বল প্রীতিমুখর মুহূর্তগুলি আমার স্মৃতির অ্যালবামে চিরদিনের জন্য আটকা পড়ল।

শ্রীনিমাইসুন্দর জানা
চতুর্থ বর্ষ। সাহিত্য

দার্জিলিঙে

পাহাড় সম্বন্ধে এতদিন শুনেই এসেছি কত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, আর কল্পনার মূর্তি গড়েছি মনে—অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে প্রতীক্ষা করেছি। সে সাধ এবার মিটল আমার। কল্পনাকে ডিঙিয়ে বাস্তব অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি। ঘরের এত কাছে, তবু এতদিন আমি আসি নি—নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মেছে।

তবু এখন পথ কিছুটা দূরে—তিন রকম ট্রেন। আর স্টীমারে গঙ্গাপার। শরীর ক্লান্ত ছিল, তবু শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে চাপবার পর মন সতেজ হয়ে উঠল মুহূর্তে—নতুনত্বের, অভিনবতার আকর্ষণে। ঠিক যেন খেলার গাড়ি, ন্যারো গেজের দার্জিলিঙ হিমালয়ান রেলওয়ে অজগরের মত এঁকে-বেঁকে হিমালয়কে বেষ্টন করে এগিয়ে চলেছে বিজয়গর্বে। দেখতে ছোট হলে হবে কি, কি তার বিপুল গর্জন, কর্ণবিদারী বিকট আর্তনাদ। কখনো লুপ, কখনো জিগ্‌জাগ্—নানা প্রক্রিয়ায় কেবলই ওপরে ওঠার চেষ্টা; কখনো বাঁ দিকে পাহাড়, ডাইনে খাদ; কখনো তার বিপরীত। সাড়ে চার হাজার ফিট ওঠবার পর কার্শিয়াঙে এলাম। বাঁচা গেল। যত দেখছি তত মুগ্ধ হচ্ছি, তত ভালো লাগছে। প্রকৃতি যেন তাঁর মূল্যবান্ মণিমুক্তার ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন।

শ্রদ্ধায় হিমালয়কে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করতে হয়। অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করতে হয় এর রূপ—বর্ণনা করা যায় না ভাষার বন্ধনীতে।

হরেন ঘোষের 'দিলবাহারে' উঠলাম। সে এ-দেশী, অর্থাৎ এখানেই ঘরবাড়ি তার। চার শ' মাইল পথ এসে শরীরও তখন প্রতিকূল। এবার খাওয়া, তার পর ঘুম।

বাধ্য হয়ে ভোর বেলাতেই শয্যা ত্যাগ করতে হল, ভোর সাতটায় দার্জিলিঙের ট্রেন। পরম উল্লাসে ট্রেনে চাপলাম। আকাশে সাদা-কালো মেঘের টুকরো। মাত্র কুড়ি মাইল, মাঝে তিনটি স্টেশনের ব্যবধান। দেখতে দেখতে চলেছি, শীর্ণকায়া ঝর্না, কিন্তু কি প্রবল গর্জন—পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে দুধে-সাদা জল ছুটে চলেছে অবিরাম, এদিকে চীনের প্রাচীরের মত পাহাড়ের বেষ্টনী।

'ঘুম' এল, পৃথিবীর সর্বোচ্চ রেল স্টেশন নাকি এটি (৭৪০৭ ফুট), সারা বছরই ঘুমন্ত থাকে, কুয়াশার অবগুণ্ঠনে ঢাকা। এখান থেকেই যেতে হয় টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে। এখানে আছে ক্যাভেণ্টার্স ডায়ারি ফার্ম; তা ছাড়া 'সিকল সেক'—

পাহাড়ের মাথায় নকল জলাধার—আর প্রখ্যাত বৌদ্ধমঠ এখানকার বিশেষ সম্পদ। আপাতত দর্শনের সৌভাগ্য হল না। মন দিয়ে শুনলাম শুধু। এর পর আবার অবতরণ, বাতাসী লুপ পাক দিতেই বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। চোখের সামনে একটা নতুন রূপজগৎ খুলে গেল। যেন এক স্বপ্নলোকে এসে গেছি, সামনে খাড়া নীল পাহাড়। অজস্র রঙিন বাড়িঘর পথ—দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন বিচিত্রবর্ণশোভিত একটা তৈলচিত্র। ক্রমশ নিকটে আসছি, আর পাওয়ার আনন্দে মন বিভোর হয়ে উঠছে, 'এতদিন যে বসে ছিলাম পথ চেয়ে আর কাল গুনে' আজ সেই চরম দিন এল যখন তোমায় আপন করে পেলাম। আমি কবি নই, সাহিত্যরসে রসিক নই, তবু মনে কি যেন এক অব্যক্ত আনন্দরসসুধার স্পর্শ অনুভব করলাম, দেহমনে অভূতপূর্ব পুলক-শিহরণ জাগল—বিস্মিত হলাম। ভাবলাম, প্রকৃতি এত সুন্দর, এমন মোহ-জাগানিয়া! দুলে উঠল মন। রোমাঞ্চিত অনুভূতির রাজ্য। দু চোখ ভরে চেয়ে দেখেও তৃপ্তি পাওয়া যায় না, এমন আকর্ষণীয়। যেন যাদু মাখিয়ে দিয়েছে আমার মনেপ্রাণে। আনন্দাতিশয্যে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। স্টেশন এল, ক্লান্ত ট্রেন থামল। স্টেশনের চেহারায় আকৃষ্ট হলাম, যথাসম্ভব সুদৃশ্য করবার চেষ্টার ত্রুটি নেই। উপর তলার রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে কফি খেয়ে শরীর তাজা করে শহর দেখতে বেরোলাম। এক মুহূর্তও তর সইছিল না। থাকা-খাওয়ার ভাবনা, ও-সব অনেক হয়েছে, হবেও—কিন্তু দার্জিলিঙ-ভ্রমণকে ব্যর্থ করা চলতে পারে না।

দ্রষ্টব্য বস্তুর একটা লিস্টি শুনে নিলাম আমার বন্ধুর কাছে।

হঠাৎ সামনে তাকিয়েই বিস্মিত হলাম। এই সেই বরফ-পাহাড় কাঞ্চনজঙ্ঘা। ক্ষণে ক্ষণে যার রূপ বদলায়—সকালে প্রথম সূর্যালোকে রক্তিম সোনা ঝরে, কিছু পরে রজতশুভ্র মূর্তি—মেঘ ও রোদের খেলার প্রতিক্রিয়ায় মেতে ওঠে তুষারকিরীট।

'চলো, প্রথম "ধীর ধাম" দেখা যাক' আমার বন্ধু মন্তব্য করল।

'তথাস্তু' বলে রওনা হলাম। তিন মিনিটের পথ, সুসজ্জিত শান্ত নিস্তব্ধ নির্জন মন্দির—ভিতরে গেলেই পবিত্র ভাব জাগে মনে। সযত্নে রচিত ফুলবাগান, বেশী সময় ব্যয় না করে বেরিয়ে এলাম। সময় কম, দ্রষ্টব্য স্থান প্রচুর—আর সবটা প্রায় হেঁটে দেখতে হবে। তা ছাড়া পাহাড়ী পথ, কখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি বলা যায় না।

প্রথমে উঠতে শুরু করলাম, ল্যাডেন'লা রোড ধরে। জেনারেল পোস্ট অফিসের পাশ কাটিয়ে ক্যাপিটালকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাচ্ছি। যত দেখছি, ততই ভাল লাগছে। এখানে ওখানে কত রঙবেরঙের ফুলের মেলা। ঝকঝকে তকতকে পথ,

ধুলোর চিহ্ন নেই, আবর্জনা নেই কোথাও। গান্ধী রোড, নেহেরু রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চাইলাম—ঘনবসতিপূর্ণ শহর। এখন আমরা অনেক উপরে উঠে গেছি। চোখে পড়ল নীল গম্বুজ—সামনে একটি, আর খুব নীচে পেছনে একটি—দুটোই প্রায় এক রকম দেখতে। একটি বর্ধমান রাজবাড়ি, অন্যটি রাজভবন, কোনটি কার অনুকরণে এ দ্বন্দ্ব বহুদিন থেকে চলে আসছে।

গ্রীষ্মের দাবদাহে অস্থির হয়ে স্বাস্থ্যসম্পদ বাড়াতে এ সময়ে প্রচুর বহিরাগতের, ভ্রমণকারীর ভিড় জমে শহরে। পথঘাট মুখর হয়ে থাকে। ম্যালে এসে পৌঁছলাম। বৃত্তাকার জায়গা, চারপাশে বসবার ব্যবস্থা রয়েছে। ভুটিয়া ছেলেমেয়েরা ছুটে এল—ঘোড়া চাই? তাদের নিরাশ করেই এগিয়ে গেলাম এ-দেশী শ্রেষ্ঠ কবি ভানুভক্তের মূর্তির কাছে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার অবসর নেই, বাঁ হাতি নীচু পথে নামতে শুরু করলাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বাসভবন 'স্টেপ অ্যাসাইড' সুসংস্কৃত হয়েছে যথেষ্ট। বৃদ্ধ মালি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে অনেক তথ্য বলে গেল—যত্ন-সহকারে দেখাল প্রতিটি কক্ষ।

এবার 'মহাকাল' দর্শন। জিমখানা ক্লাবের ধার ঘেঁষে পাহাড়ী পথে উঠছি। অসুবিধে হলেও আনন্দের প্রাবল্যে ক্লান্তি হচ্ছে না ততটা। দুপাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ দেখা হরেন—এখন ফুল নেই, কিন্তু একেবারে লাল হয়ে থাকে, মনে হয় পাহাড়ে আগুন জ্বলছে। হিন্দু ও বৌদ্ধের মিলিত এই মহাকাল মন্দির। সাধারণ মন্দিরের সঙ্গে এর মিল নেই একফোঁটা।

রাজ্যপালের বাসভবনের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি—নীচুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার বন্ধু—'ঐ দেখো, লিবং রেস্ কোর্স।' বৃত্তাকার গেরুয়া মাঠ—দেখবার মতই বটে। এতদূরে আজ আর যাওয়া হবে না। দূর থেকে দেখেই পরিতৃপ্ত হতে হল। রাজ্যপাল-ভবন অতিক্রম করে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। সুদৃশ্য পার্ক পেরিয়ে এলাম 'নেচারেল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে', দেখতে ছোট, কিন্তু তুচ্ছ নয়। বিশেষ করে ছোটখাট পতঙ্গ ও প্রজাপতি এখানকার বিশেষ সম্পদ।

কিছুই আর মন ভরে দেখতে পারছি না। সদাব্যস্ত ভাব। এবার জনবিহীন পথে নামতে শুরু করলাম, উদ্দেশ্য 'বার্চ্‌হিল' দর্শন। পথ নেহাৎ কম নয়। হাঁটছি তো হাঁটছি। 'এই দেখো গভর্নমেণ্ট কলেজ, ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে', হঠাৎ থেমে আমার বন্ধু বলল। কলেজ হবার উপযুক্ত ঠাঁই বটে, কোলাহল নেই, মুখরতা নেই, শান্ত নির্জন। কিছু পথ পাহাড় ভেঙে বার্চ্‌হিলে এলাম। এবার কিছুক্ষণের

বিশ্রাম। যতক্ষণ হেঁটেছি ততক্ষণ ক্ষুধা-ক্লান্তি বোধ ছিল না। এখন প্রবলভাবে অনুভব করলাম। কিন্তু এই পাহাড়-চূড়োয় তো আর সম্ভব হবে না। বাধ্য হয়েই বাজারের দিকে নামতে হল।

কলেজকে বাঁ হাতি রেখে এগিয়ে চললাম শহরের দিকে। প্রায় সবই তো দেখা হল। আর যা বাকি তা আর এখন হচ্ছে না। জলাপাহাড় এ দফায় হবে না। তা ছাড়া সবই যদি একবারে দেখে ফেলি তা হলে পরে দেখব বলে হাতে আর কিছুই থাকবে না।

সন্ধ্যের মধ্যে ফিরতে হবে কার্শিয়াঙ। তার মধ্যে যা দেখা যায়। কিছুটা ফ্রেশ হয়ে নবীন উদ্যমে বোটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্দেশে পা চালালাম। সবচেয়ে সুন্দর হট্-হাউস। ঘুরে ঘুরে সব দেখছি। তৃষ্ণা তবু মেটে না। এ কুঞ্জেও দু দণ্ড বিশ্রাম না করাটা পাপ। পুরু ঘাসের আসনে বসে পড়লাম। 'ভিক্টোরিয়া ওয়াটার ফল্স্' দেখবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও হরেনের বিরোধিতায় আর হল না। এখন নাকি জল নেই, সব শ্রম পণ্ড হবে। ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে, শেষরাতের তৈলহীন প্রদীপের মত সূর্যালোক ম্লান হয়ে আসছে। এবার উঠতে হয়। নইলে ট্রেন ফেল অনিবার্য। এই পাহাড়ের রূপরস সৌন্দর্য কি বাঁধনে যে বেঁধেছে মনকে, এ মায়াডোর ছিন্ন করা দুষ্কর। তবু যেতে যখন হবেই।—

কত দিনের স্বপ্ন আজ সত্য হল। অফুরন্ত আনন্দে মন ভরপুর, তবু ক্ষীণ বেদনা অনুভব করলাম মনে, বিচ্ছেদের বেদনা। যদি তোমায় পেলাম, তবে এখনি কেন ছাড়তে হবে? কেন তোমার সান্নিধ্য বেশী করে পেলাম না? ট্রেনের শেষ হুইস্‌লে চমকে উঠলাম! কি আর্তনাদ, যেন আমারই মনের বেদনার সুরের প্রতিধ্বনি। তবু এই তো শেষ নয়; আবার আসব, যখনই সুযোগ হবে। আর তোমার স্মৃতি রইবে অম্লান মনের কোঠায়।

শ্রীঅমল সান্যাল
চতুর্থ বর্ষ। সাহিত্য

অবিস্মরণীয়

মানুষের জীবনে কতই না নতুন ঘটনা ঘটে থাকে। মানুষই তাকে রূপ দেয় তার সঞ্চয়ের খাতায়, ধরে রাখবার চেষ্টা করে নিজেদের ডায়েরিতে। সে-সকল বৈচিত্র্যময় দিনগুলি বন্দী হয়ে থাকে তাদের খাতায়। কি জানি, হয়তো এ কথা ভেবেই যে, সেদিন হয়তো ফিরে আসবে না, আর এলেও হয়তো আসবে না গতদিনের সে রহস্য নিয়ে, সে রঙিন স্বপ্ন নিয়ে। তাই তো মানুষের এ প্রচেষ্টা ডায়েরি লেখার। আমরা নিজেদের মধ্যে সীমারেখা টেনে ব্যস্ত থাকি নিজেদের কাজে, চেষ্টাও করতে চাই না দু চোখ উপরে তুলে আকাশ-হাওয়ার আলপনা দেখতে, দূরের ঝর্নার গান শুনতে, বনের পাতার আহ্বানে সাড়া দিতে। প্রকৃতির এ ডাককে আমরা এড়িয়ে যাই। চেষ্টা করি নে প্রকৃতির এই রস-উৎসের সন্ধান করতে। মেঘ উড়ে যায়; দূরে পাহাড় আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে; সন্ধ্যার আকাশে পাখি তার কুলায়ের পথে ডানা দিয়েছে ভাসিয়ে; হয়তো বা মাঝি দূর-পাল্লার পথে দিয়েছে নৌকায় পাল তুলে, ধরেছে ভাটিয়ালী-গান,—এ ছবি আমরা হয়তো রোজই দেখি, কিন্তু রোজই তো আমাদের চোখে নতুন লাগে। রোজই তো ধরিয়ে দেয় নেশা,—প্রকৃতি তার অফুরন্ত রঙের ভাণ্ডারে আমাদের মনকে মাতিয়ে তোলে। প্রকৃতির বুকে এই যে নিত্য বৈচিত্র্যময় নতুন নতুন ঘটনা—আমরা চেষ্টা করি নে নিজেদের সঞ্চয়ের খাতায় সে-সকল রঙিন ছবিকে তুলে ধরতে, তুলে ধরতে সে-সকল অবিস্মরণীয় মুহূর্তকে, মনে রাখতে সে-সকল রঙিন দিনগুলিকে।

ডায়েরি লেখার প্রচেষ্টা অনেকেরই রয়েছে, কিন্তু আমার দিক থেকে সে চেষ্টা আজও হয়ে ওঠে নি। তবু, বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির একদিনের অবিস্মরণীয় কাহিনী কি জানি কি খেয়ালে খাতায় টুকে রেখেছিলাম; সেদিন থেকে সেই আমার প্রথম অভিযান প্রকৃতির বুকের ছন্দ-দোলা সেই পরম মুহূর্তকে নিজের করে রাখবার:

কার্শিয়াং। ১৬. ৭. ৫৩

একটা দিনের কথা বেশ মনে পড়ে। পর পর দু-তিন দিন একটানা কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ঢেকে ফেলেছিল এই পার্বত্য ছোট্ট শহরটিকে। বর্ষাকাল, বৃষ্টি তো হবেই—পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টি না হওয়াটাই তো বিশেষ আশ্চর্যের। সমতল ভূমিতে দেখেছি—

সারা আকাশ কালো করে কখনও বা জোরে বৃষ্টি এল, সঙ্গে কখনও বা উপরি পাওনা হিসাবে জোর হাওয়াটা দেখা দিত। কালো মেঘে ঢাকা আকাশখানি হয়তো তখন বইয়ে পড়া কোনও আগ্নেয়গিরির ঘুমভাঙার কথা স্মরণ করিয়ে দিত। এখানে কিন্তু তেমনটি নয়। হয়তো দেখছি দক্ষিণদিক থেকে কালো মেঘ একেবারে দল পাকিয়ে উত্তরে দৌড়ে আসছে, আর সামনের ইতস্ততঃ ছড়ানো সাদা টুক্‌রো মেঘদল পাহাড়ের কোল ঘেঁসে উঠেছে;—অনেক সময় দেখা যায় হাওয়ার গতিবেগ যখন কমে যায় তখন সেই বিভীষিকাময় কালো মেঘ ধীরে ধীরে সেখানেই তার রথের রশি টানতে বাধ্য হয়। কিছুক্ষণ ধরে থেমে থাকবার জন্য কান্না জুড়ে দেয়, বৃষ্টি হয়। মজা এই যে, হয়তো দক্ষিণ আকাশের বুকে এই কান্নার ঝর্না বইছে, আর ঠিক তারই পাশে আর একটা পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে পড়ছে সূর্যের সোনার দীপ্তি। ঢেউ-খেলানো পাহাড়ে তখন জেগে ওঠে আলো-ছায়ার মেলা। একদিকে হাসি আর একদিকে কান্নার বন্যা!

হাসি গেল কোথায়? হাল্কা কুয়াশায় (ফগ) হাসির সে দীপ্ত আশা নিভিয়ে দিয়ে গেল। বাঁ থেকে ডাইনে—সবদিকের গাছপালা, ঘরবাড়ি সব কিছুরই উপর একটা পাতলা আবরণ পরিয়ে দিয়ে গেল—'ওয়াশের' কাজ করতে নিপুণ শিল্পী যেমন রঙ চাপিয়ে জলে ডোবায়। কুয়াশার আবরণটা কোথাও পাতলা, কোথাও মোটা হয়ে পড়ে; উড়ে যাওয়া কুয়াশার মাঝ থেকে কোথাও বা আবার ঘরবাড়ি বা পাহাড়ের কোনও অংশ দেখা যায়। তাই বা কতক্ষণ আর? হয়তো পরমুহূর্তের ঘন কুয়াশা সে-সবও গ্রাস ক'রে ফেলে। অনেক সময় অবস্থাটা এমনও হয় যে, সামান্য পনেরো কুড়ি ফুট দূরের গাছপালা বা কিছুই দেখা যায় না। এমন ভাবে হয়তো কিছুক্ষণ চলে। আবার এক নাগাড়ে দিনও কেটে যায়। হয়তো মাঝে মাঝে বৃষ্টিও হয়ে যায় দু-এক পশলা। পরিষ্কার হয়ে যায় আকাশ। কেটে যায় ঘন কুয়াশা। আকাশ ফুঁড়ে ঠিকরে পড়ে সূর্যের কিরণ। যেন সোনা ঝল্‌মল্ করছে।

তখন চারিদিক পরিষ্কার। স্নানের শেষে মানুষ যেমন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে নিজেকে তৈরী করে নেয়, এও ঠিক তেমনি! নতুন স্নানের শেষে গিরিরাজ হিমালয় যেন জেগে উঠলেন। নতুন সাজে নিজেকে যেন মানিয়ে নিলেন। দূরে পাহাড়ের তরঙ্গের বুকে জেগে উঠল মেঘদল। নতুন আলো পেয়ে যেন কোলাহল করতে চাইছে, চাইছে খেলা করতে, চাইছে ছুটতে। টুক্‌রো-টুক্‌রো মেঘ যেন সত্যিই পাহাড়ের গায়ে জটলা করছে। যেন কানাকানি করছে প্রকৃতির এই নতুন

সাজ দেখে। আনন্দে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে চাইছে যেন। এক পশলা বৃষ্টি-শেষে পার্বত্য পরিবেশে যে যে নতুন দৃশ্যের উদয় হয় তা চোখে না দেখলে বর্ণনা করে বোঝানো কঠিন। পাহাড়ের গায়ে এসে জমা জমাট-বাঁধা মেঘের পর যখন দিনমণির স্নেহের কিরণ এসে পড়ে তখন কি শোভাই না প্রকাশ পায়! গিরিরাজ হিমালয়ও যেন হেসে ওঠেন, নেচে ওঠেন মনের ছন্দে। নীচ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে সাদা মেঘ আস্তে আস্তে সোজা উঠবার চেষ্টা করে পাহাড়ের গা বেয়ে। চেষ্টা করে শিখরদেশ ছোঁবার। চেষ্টা করে স্পর্শ করতে দেবতাত্মা হিমালয়কে। হয়তো দূরে পাহাড়ের সারা দেহ জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুধ-মেঘদল। সাদা ফেনা যেন ছিটকে পড়তে চাইছে। পাহাড়ের বন-সম্পদ—সবুজ আভরণ—সূর্যের আলো পড়ে কোথাও বা আবছা নীল ধারণ করেছে, কোথাও সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে সবুজে। দূরের পাহাড়ের ঢেউগুলি যেন পরিষ্কার আকাশে আরও মধুর হয়ে উঠল।

সন্ধ্যায় অস্তমান সূর্যের সপ্তরথ-অভিযান আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। প্রকৃতি যেন তার রঙের ভাণ্ডার থেকে অকৃপণ হাতে সমস্ত রঙ ঢেলে দেন। তখন প্রতিটি মুহূর্ত যেন তারই অপেক্ষা রাখে। প্রকৃতি তার সুনিপুণ হাতে, শ্রেষ্ঠ তুলিতে বুলি কোটায় আকাশের বুকে। হাসির ঝলক খেলে ওঠে সূর্যদেবের হাসির ছন্দে। পাহাড় ডিঙিয়ে পশ্চিমে অস্ত যাবার পথে রঙিন আলোকমালায় সবাইকে যেন অভয়বাণী শুনিয়ে যায়—'ভয় নেই, আবার আসছি, একটা রাতের অপেক্ষা তো মাত্র।' অবাক নয়নে নিজেকে হারিয়ে চেয়ে থাকি সেদিকে।

বর্ষায় পার্বত্য এলাকায় সূর্যদেবের অস্তগমনের এমন মধুময় দৃশ্য দেখবার সুযোগ খুব কমই মেলে। ঝড়-বাদলেইতো প্রায় আকাশ থাকে ঢেকে। আর অমন দৃশ্য এই মনস্থন মরশুমে দেখবার সৌভাগ্য সব সময় কোথায়?

শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত
প্রথম বর্ষ। সাহিত্য

আইনস্টাইন

বার্লিনের একটি বাসের আরোহী কণ্ডাক্টারের হাত থেকে টিকিট নিলেন; আর খুচরো মুদ্রা ফেরত নিয়ে গুনে বললেন, "এ কি দিলে? ভুল হল যে।" কণ্ডাক্টার নিজের হাতে পয়সাগুলো নিয়ে ভালো করে গুনে একটু বিরক্তির সঙ্গে আবার যাত্রীর হাতে ফেরত দিলে। আর, একটু নীচু গলায় একটা মন্তব্যও করলে—"গণিতবিদ্যায় মশায়ের দখলটা কিছু কম।" গণিতবিদ্যায় অজ্ঞতার জন্যে যে ব্যক্তিকে বাস কণ্ডাক্টারের তিরস্কার শুনতে হয়েছিল, পদার্থবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার করে তিনিই একদিন বিশ্বকে বিস্মিত করেছিলেন।

আইনস্টাইন

আপেক্ষিক তত্ত্বের উদ্ভাবক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আজ পৃথিবীতে নেই; কিন্তু তাঁর কীর্তি শুধু এ যুগে নয়, অনন্ত কাল ধরে তাঁকে অমর করে রাখবে। টাকার ভাঙানি গুনে নিতে যিনি ভুল করেছিলেন, বৈজ্ঞানিক সমাজ কিন্তু তাঁকে ভুলবে না। $E=MC^2$ এই সংকেতসূত্র (formula) বিজ্ঞানের দরবারে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

E অর্থাৎ energy বা শক্তি। M অর্থাৎ mass বা ভর। C অর্থাৎ আলোকের গতিবেগ। আলোকের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। C^2 অর্থাৎ এই গতি-বেগের বর্গ। $E=MC^2$এর অর্থ যা দাঁড়াচ্ছে তার তাৎপর্য এই যে, বস্তুমাত্রকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, এবং অতি সামান্য বস্তুপিণ্ডকেও রূপান্তরিত করলে অপরিমিত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। এক কণা বস্তুর মধ্যেও এতখানি শক্তি থাকতে পারে যার পরিমাণ ঠিক সংখ্যা দিয়ে বোঝানো কঠিন। কি পরিমাণ

ভর থেকে কি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে, এই সংকেতসূত্রে তারই হিসেব দেওয়া হয়েছে।

সমগ্র কলকাতা শহর ও শহরতলিতে যত আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, ট্রাম চলে, কল-কারখানা চলে, এর জন্যে কতখানি বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হয় একবার ভেবে দেখুন। আইনস্টাইনের সূত্র অনুসারে এক পোয়া বস্তু থেকে যে পরিমাণ শক্তি বেরোতে পারে তা দিয়ে পুরো এক বছর ধরে কলকাতা ও শহরতলির বৈদ্যুতিক শক্তির সমস্ত কাজই স্বচ্ছন্দে চালানো যাবে।

আণবিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োগ করাই এই বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু মানুষ তাকেই ধ্বংসের কাজে লাগিয়েছে; অমৃতকে পেয়ে সে খুশী হল না, তাকে সে হলাহলে পরিণত করে উন্মত্তের মত নৃত্য করছে।

ভারতবর্ষ শান্তির উপাসক, ভারতবর্ষ এই উন্মত্তের রণকোলাহল থেকে দূরে থাকতে চায়। পশ্চিমের সঙ্গে এইখানে তার তফাত। আইনস্টাইনের উদ্দেশ্যকে সফল ও সার্থক করে তোলার দায়িত্ব আজ তাই ভারতবর্ষের উপরেই বর্তেছে। ভারতবর্ষ একদিন কর্মকে জ্ঞানের মধ্যে সমাহিত করেছিল, আজ নূতন করে সে জ্ঞানকে কর্মে পরিণত করুক এবং সেই অনুপাতে করুক যে অনুপাতে বস্তুপিণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়। আইনস্টাইনকে শ্রদ্ধা দেখানোর তার চেয়ে বড় পথ আর কিছুই নেই। তাতে শুধু তাঁকেই সম্মান করা হবে না, তার চেয়েও বড় কাজ হবে—তাঁর মহান্ উদ্দেশ্য সফল হবে, মানবজাতির কল্যাণ হবে।

শ্রীঅশোকবিকাশ ভট্টাচার্য
চতুর্থ বর্ষ। সাহিত্য

আইনস্টাইনের ছবিটি এঁকেছেন প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান-এর ছাত্র শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মন্ডী

ডিম

'ডিম নেবেন মা, ডিম ?'

শান-বাঁধানো বারান্দার ওপর ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে আর একবার বলল লোকটা, 'ডিম লাগবে নাকি, মা ? হাঁস, মুরগি সব রকমই আছে।'

'না।'

বেশ জোর দিয়েই বলে দিল রীতা। যত-সব আপদ এসে জোটে পরীক্ষার সময়। এই তো সেদিন এক হাঁড়ি ডিম দিয়ে গেছে হামিদ মক্কেল।

চিন্তায় মোড় ঘুরিয়ে নিল রীতা। এই প্রশ্নটা এবার আসবেই আসবে। সব ক'টা কলেজ থেকেই সাজেশান দিয়েছে এটা। লাল পেন্সিল দিয়ে বার কতক দাগ দিয়ে 'প্রয়োজনীয়' বলে লিখে রাখল পাশে।

'এক ঘটি পানি দেবেন, মা ? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—'

'নাঃ! একেবারেই অসম্ভব।' বইপত্তর গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া কোন উপায়ই নেই আর। এ ঘরে এসেই ভুল করেছে ও। রাস্তার ধারে বসলে এরকম যে হবে সে তো সবাই জানে। কেন, ওপরের ঘরে বসলেই হত ? কিংবা ছাদে পায়চারি করে পড়লেই বা ক্ষতি ছিল কি ? যেমন এ ঘরে বসেছে তখন তো ফল ভোগ করতেই হবে।

'কেন, রাস্তার কলে খেলে কি জাত যাবে নাকি ?' ঝাঁঝিয়ে উঠল রীতা।

'রাস্তার পানি যে বন্ধ হয়ে গেছে, মা।'

ক্ষীণ শব্দের প্রতিটি তরঙ্গ এক এক করে ছুঁয়ে গেল রীতাকে। সত্যিই তো। কোন্ কালে একটা বেজে গেছে ঘড়িতে। আহা! বেচারা গরিব মানুষ। না জানি কতটা পথই হেঁটে এসেছে এখানে। সোনা-রুপো নয়, সামান্য একটু জল চাইতেই এমন করে ঝাঁঝিয়ে উঠল ও ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে ওর।

যতটা পারল গলা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।'

এ কথার উত্তরে লোকটা যে বিড়্‌বিড়্ করে কি বলল ঠিক বোঝা গেল না। হয়তো 'আল্লা আপনার মঙ্গল করুন, মা' এ কথাই বলেছে ও। নয়তো আত্মতুষ্টির জন্য বার বার প্রণাম জানিয়েছে বিধাতাকে।

শাড়ির আঁচলটা বেশ করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে, অ্যালুমিনিয়মের জাগ ভর্তি করে এক জাগ জল নিয়ে এল রীতা। তার পর বেশ মিষ্টি করেই বলল, 'নাও, হাত পাতো।'

'আগে একটু পানি দিন দিদিমণি, রাজ্যের ধুলো লেগে আছে হাতে, ভাল করে ধুয়ে নি হাতটা।'

মা থেকে দিদিমণিতে নেমে আসাতে বিন্দুমাত্রও অবাক হয় নি রীতা। বরঞ্চ ভালই লাগল ওর। 'মা' ডাক শুনলে কেমন যেন গিন্নি গিন্নি মনে হয় নিজেকে। আর লোকটারই বা দোষ কি? কণ্ঠস্বর শুনে কি আর মা দিদিমণিতে তফাত বোঝা যায়? দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল রীতা। লোকটা তখনও বেশ করে রগড়ে রগড়ে হাত ধুয়ে নিচ্ছে।

খুঁটিয়ে দেখছিল রীতা। গৌরবর্ণ চেহারা। যথেষ্ট লম্বা। কাঁচাপাকা দাঁড়ি। পরনে নীল লুঙ্গি, আর ফতুয়াই বলা চলে। বয়সের তুলনায় একটু অকালেই বার্ধক্য এসেছে লোকটার। হাতে গলায় গোটা-কতক মাদুলি। লোকটা যে মুসলমান তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু যাই হোক, এককালে যে ও সুন্দর ছিল তা বেশ বোঝা যায়। একটা চোখ না থাকায় লোকটাকে বসিয়ে দিয়েছে একেবারে। তবে জন্মকানা যে নয় তা যে-কেউ বলতে পারে। অস্ত্রোপচারের পরিষ্কার ছাপ রয়েছে চোখে। কিসে যেন পুড়েও গিয়েছিল মুখটা। বাঁ ধারের গালটা কান পর্যন্ত প্রায় সবটাই পুড়ে গেছে।

আরে! ঠিক এরকম একটা লোক যেন কোথায় দেখেছে রীতা—ফর্সা, একটা চোখ কানা, বাঁ দিকের গাল পোড়া। ঠিক এরকম লম্বা। আর, তার ওপরে মুসলমান। দেশে থাকতে কি? না, না। এরকম কোন লোকই নেই দেশে। আর থাকলেই বা কি? এতদিনের কথা কি ওর মনে আছে নাকি?

বহরমপুর থেকে আসার পথে শিয়ালদা স্টেশনের সেই গাড়োয়ানটা নয় তো? না, না। সে হতে যাবে কেন? ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান কি আর ডিম বেচতে আসবে নাকি! তবে অসম্ভবও নয়। অদৃষ্টের চক্রান্তে মানুষকে অনেক কিছুই করতে হয়। যতদূর মনে হচ্ছে রীতার, এটা সে লোক নয়। গাড়োয়ানটা ওর চেয়ে লম্বায় অনেকখানি ছোট ছিল। তবে কি কোন গল্প-উপন্যাসে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে অথবা অন্য কোন ছোট গল্পে? সে তো হতেই পারে না। রীতা একবার যে গল্প পড়ে, সহজে সে গল্প ভোলে না। লজিক-সিভিক্সে না থাকলেও, গল্প উপন্যাসে যে ওর স্মরণশক্তির প্রাখর্য যথেষ্ট এ তো সকলেই জানে। তবে কি কেউ গল্প বলেছিল? চট্‌পট্ অনেকগুলো বছরের পাতা উল্টে গেল রীতা।

এইখানেই কাহিনীর শেষ করল বিনোদিনী। ঘর মোছার ন্যাকড়াটা বার কয়েক বালতিতে ডুবিয়ে নিয়ে বলল, 'শেষ হয়ে গেল দিদিমণি।' গল্প শুনতে গিয়ে অনেকগুলো ঘর ভুল তুলেছিল রীতা, উলে টান দিয়ে ঘর খুলতে খুলতে বলল, 'সে কি!'

সার্কাস রেঞ্জেরই একটা বাড়িতে থাকত ওরা। ওরা মানে—আবদুল মিঞা

আর তার দুই বিবি, হাসনা ও সুরাইয়া। অত্যন্ত মামুলি ভাবেই গল্পের আরম্ভ করেছিল যিনি। আলীপুর কোর্টের বেশ নামজাদা মুহুরি ছিল আবদুল। বেশ বিচক্ষণ কাজেকর্মে। সব দিক মিলিয়ে মোটামুটি ভালই রোজগার করত ও। কিন্তু রোজগারের অধিকাংশই ব্যয় করত সে হাসনার পেছনে অবশ্য যুক্তি ছিল আবদুলের। হাসনা সুন্দরী এবং অপরূপা। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় জনের কি প্রয়োজন ছিল ওর? প্রথম দিকে থাকলেও, এখন সুরাইয়া বিবি নয়, বাঁদি। বাঁদির সঙ্গে বিবির তো পার্থক্য থাকবেই। তবুও মন ওঠে নি হাসনার। কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে ওর চেহারা নিয়ে। রাগে পেয়ে অশ্রাব্য বচন শুনিয়েছে অনেক। এমন-কি দু-চার ঘা বসিয়ে দিতেও কসুর করে নি হাসনা। হাসনার দোষ নেই তাতে। কিন্তু কোন উচ্চবাচ্যই শোনা যায় নি আবদুলের তরফ থেকে। মৌন থাকাই যখন সম্মতির লক্ষণ তখন হাসনার পেছনে যে তৃতীয় ব্যক্তির পূর্ণ সমর্থন রয়েছে, সেটুকু বুঝে নিতে খুব বেশীদিন লাগে নি সুরাইয়ার। কিন্তু কিছুতেই যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে নি আবদুল। হাসনার কাছে অনেকদিন শুনেছে ও, আর্থিক যোগ্যতা যার নেই তার আবার যোগ্যতা কিসের? আবদুলও যে বুঝতে পারে নি তা নয়। হাসনা শুধু সৌন্দর্যপিপাসুই নয়, অর্থপিপাসুও বটে। অনেক চিন্তা করেছে আবদুল, কিন্তু ভেবে উঠতে পারে নি কিছুই। হাসনাই পথ বাৎলে দিয়েছে শেষে। গফুর চাচার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে হাতেনাতে। শেষ পর্যন্ত তাই করল আবদুল। জুয়ার নেশা পেশায় গিয়ে দাঁড়াল ওর। টাকার অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল হাসনার। মাসে মাসে, বছর থেকে বছরে। অদৃষ্টের একটানা সমর্থনে, যোগ্যতার আংশিক পরিচয় হয়তো দিতে পেরেছিল আবদুল, কিন্তু খুব অল্প দিনের জন্যই। গড়িয়ে গড়িয়ে ধাপে ধাপে নেমে যেতে লাগল ওরা। যে ক'টা সংখ্যার সমষ্টি নিয়ে বিরাট অঙ্ক কষেছিল আবদুল, বিয়োগ দিয়ে দিয়ে সবটাই প্রায় মিলে গেল তার। যথেষ্ট বিচলিত হয়ে পড়ল আবদুল। তবু হাল ছাড়ল না। ঠিক একই ভাবে রাত-বিরাতে বেরিয়ে যেত সে, আর ভোর রাতেই ফিরে আসত ঘরে। রাত জেগে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে লাগল আবদুলের।

অনেকদিন থেকেই জিজ্ঞেস করবে ভাবছে সুরাইয়া। কিন্তু সাহস হয় নি ওর। হাসনাও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করে নি কোনদিন। অবাক লেগেছে সুরাইয়ার। এখন আর রাত ঘুরে বাড়ি ফেরে না আবদুল। কলতলার পাশে ছোট্ট ঘরটায় খিল তুলে দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কি যেন করে আবদুল। অনেকদিন ছুতো করে ঘোরাফেরা করেছে ওখান দিয়ে, কিন্তু কিছুই আঁচ করতে পারে নি সুরাইয়া। আরও আশ্চর্য

লেগেছে ওর—ঘরে বসে এত টাকা কোথা থেকে যোগাড় করছে আবদুল! কিন্তু খুব বেশী প্রশ্রয় দিতে পারে নি এই অনুসন্ধিৎসাকে। হাসনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সব সময়েই অনুসরণ করেছে ওকে। তা সত্ত্বেও পেছিয়ে পড়ে নি সুরাইয়া। গভীর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে ও। ইন্দ্রিয় সজাগ করে উঁকিঝুঁকি মেরেছে বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে, কিন্তু খুটখাট শব্দ ছাড়া কিছুই শোনে নি সে।

শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল সুরাইয়া। কালোরাত্রির গাঢ় অন্ধকারেও আর একজনের অস্তিত্ব বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে নি ওর। পরদিন দুবার যেতে দেখেছে হাসনাকে। আবদুলের অনুপস্থিতির সুযোগে ঘরে গিয়ে কি যেন করছিল হাসনা। রান্নাঘর থেকেও ক্ষীণ শব্দ কানে গিয়েছিল ওর—'গেলাম, গেলাম—আল্লা'। তবু ছুটে যায় নি সুরাইয়া। আঙুল বাঁধা অবস্থায় কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এসেছিল হাসনা। তার পরেও একবার ঘরে ঢুকেছিল ও।

সে রাত্রে আর উঁকি মারতে যায় নি সুরাইয়া। কিন্তু তবুও ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল ওকে। আবদুলের আর্তনাদে স্থির থাকতে পারে নি সুরাইয়া। হাসনা ওর আগেই এসে গেছে ওখানে।

দু হাতে বাঁ গাল ধরে প্রাণপণ চীৎকার করছে আবদুল—'জ্বলে গেল, জ্বলে গেল বিবি, এ-সব কাজ কে করলে আল্লা।'

সান্ত্বনার পরিবর্তে শাসন এসেছে হাসনার তরফ থেকে—'চুপ্, পাড়ার লোক কি ভাববে?'

অন্তর্দাহ হয়েছে সুরাইয়ার। বাঁদি হয়েও তার বাঁদির কর্তব্য করবার অধিকার নেই এখানে। সারারাত ধরে ছট্‌ফট্ করেছে আবদুল। কি যেন একটা মলম ঘষে দিয়েছিল হাসনা, কিন্তু তাতে একবিন্দুও যন্ত্রণা কমে নি ওর। দরজায় কান লাগিয়ে সান্ত্বনা শুনেছে সুরাইয়া—'ওকে মেরে ফেলো, বুঝলে? যে তোমাকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল, তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে না?' অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েও হাসনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আবদুল।

পরদিন আর গার্হস্থ্য চিকিৎসায় কাজ হল না আবদুলের। যন্ত্রণা ক্রমে ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে হাসপাতালে পাঠানো হল আবদুলকে।

সেদিনই বেরিয়ে গেল সুরাইয়া। আর ফেরে নি আবদুলের সংসারে। জিজ্ঞেস করে করে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে হাজির হল সুরাইয়া। এক নম্বর ওয়ার্ডে এসে, আবদুলের কথা জিজ্ঞেস করল নার্সকে। নাইট্রিক অ্যাসিডে পুড়ে গেছে আবদুল। ভেতরকার

মাংসও পচে গেছে ওর। সেইসঙ্গে একটা চোখ হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে চিরকালের জন্য। আবদুলই বলেছে ডাক্তারকে, 'কে যেন অ্যাসিডটা ছুঁড়ে মেরেছে মনে হল।'

মাস-দেড়েক পর আবার খোঁজ নিতে এসে ফিরে গিয়েছিল সুরাইয়া। হাসপাতালের পোশাক ছেড়ে কয়েদীর পোশাক পরতে হয়েছে আবদুলকে। কিছুমাত্র অবাক লাগে নি সুরাইয়ার। গল্পের সূচনা যখন হয়েছিল তখন সমাপ্তি যে ঘটবেই তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

রাত ঘুরে আবদুল ডাকাতিই করত তা হলে। হাসনা নিশ্চয়ই জানত না এ কথা। অবশ্য জানলেও বাধা দিত কি না হাসনাই বলতে পারে। বহুদিন পর কান ঘুরে অনেক কথাই শুনেছে সুরাইয়া। পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে আবদুলের। জলন্ত জিঘাংসা নিয়ে ও কারাগারে গেছে। বেরিয়ে এসে যেমন করেই হোক খুঁজে বার করবে সুরাইয়াকে। শাস্তি দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাবে ওর। যে শাস্তির কথা, সুরাইয়া কেন, জগদ্বিখ্যাত দাগী আসামীও কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি।

আর, সাতদিনের জ্বরে মারা গেছে হাসনা।

এই পর্যন্ত বলেই কাহিনী শেষ করল বিনোদিনী।

এবার বিস্ময়ে প্রশ্ন করল রীতা—'এ কি! শেষ হয়ে গেল? আবদুলের কি হল বললে না?'

বিনোদিনী আর কথা বাড়ায় নি সেদিন। সংক্ষিপ্ত উত্তরেই শেষ করে দিল গল্পটা। জেল থেকে বেরিয়ে নাকি ওর খোঁজে বাড়ি বাড়ি ডিম বিক্রি করে বেড়ায় আবদুল।—কান ঘুরে এ কথাও শুনেছে সুরাইয়া।

আশ্চর্য! বিনোদিনীর গল্প সত্যি নয় তো? কে জানে? বিনি থাকলে হয়তো ঠিকমতই যাচাই করে নিতে পারত।

'দিন দিদিমণি। পানি দিন আস্তে আস্তে'—দুটো হাত একসঙ্গে করে পেতে দিল ডিমওয়ালা।

অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল রীতা। এক জাগ জল সবটাই রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসে, ধড়াস্ করে মুখের ওপর বন্ধ করে দিল দরজাটা।

শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত
চতুর্থ বর্ষ। বিজ্ঞান

খোলো খুলো

পতাকা উত্তোলন

আলো ছায়া

হাতের কাজ

দাবি

বুড়ীর সঙ্গে আলাপ ছিল, এবার তার ছেলের সঙ্গে আলাপ হল।

পাতলা পাতলা গড়ন, ফরসা রং, আর চোখে একটা তীব্র দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি আমার মুখের ওপর সোজাসুজি ফেলে বলল, 'আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?'

সামনের চেয়ারটায় ওকে বসালাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কি প্রথমেই এখানে এসেছিলে, না আগে কলকাতায় এসেছিলে? বুড়ীপিসী তো বলল অনেক জায়গা ঘুরেছেন।'

প্রশ্নটা নিতান্তই কথার কথা—আমি সেই ভেবেই ওকে এ প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম মস্ত ভুল করেছি। ঘর খোঁজার ইতিহাস সব জায়গায় সমান নয়। স্বদেশে গৃহহীন ব্যক্তি যদি ঘর খোঁজে, তাকে বলি বাড়ি খোঁজা, আর সাম্প্রদায়িক কূটচক্রের ঘূর্ণাবর্তে যারা স্বদেশ থেকে ছিটকে পড়ে বিদেশে, তাদের বলি উদ্বাস্তু—তাদের ঘর খোঁজার ইতিবৃত্ত মর্মান্তিক।

ছেলেটি কি বলতে যাচ্ছিল—আমি তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে গেলাম।

'আচ্ছা, সে যাক্।—আমাদের গ্রামটা কেমন? ভালো লাগছে?'

ছেলেটি একটু হাসল এবার। বললে, 'ভালোই। তবে—'

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'তবে! তবে কি?'

'একটা নদী থাকলে বেশ হত।'

আমি সশব্দে হেসে উঠি।

'বাঃ, তোমার তো বেশ পছন্দ আছে—তোমাদের গ্রামে কি নদী ছিল নাকি?'

ছেলেটি ঘাড় নাড়লে—ছিল একটা নদী, নাম হল রুপাই।

'বাঃ, বেশ নাম তো—'

'আমি সেই নদীতে সাঁতার দিতাম, সাঁতারে আমার সঙ্গে কেউ পারত না; আর একটা ডোঙা ছিল আমাদের, আমি আর দিদি সেই ডোঙায় চড়ে গঞ্জে যেতাম—'

তার পরেই দুজনে চুপ করেছি। হঠাৎ কোথা থেকে একটা রহস্যময় নীরবতা এসে আমাদের দুজনের গলা চেপে ধরেছে। একদা পূর্ববাংলার একটি ছোট্ট নদীতে, একটি দুরন্ত মেয়ে একটি দুরন্ত ছেলের ডিঙি চড়ার সঙ্গিনী ছিল। আজ সকালের এই সুন্দর রোদ যেন সেই সঙ্গিনীর নাম উল্লেখে লজ্জিত হয়ে পড়ল। অথচ সে কোন

লজ্জার কাজ করে নি। গুণ্ডারা যখন বাড়ি চড়াও হল, তখন সে খিড়কির দরজা দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়েছিল; নিদারুণ লজ্জায় খিড়কির পুকুরে ডুব দিয়েছিল, আর ওঠে নি। গল্পের শেষে বুড়ীপিসী কেঁদে ফেলেছিল মার কাছে, বলেছিল, 'জানো বউঠাক্‌রান? ছেম্‌রির লগে আজো আমার চোখে ঘুম নাই, এতটুকু ঘুম নাই।'

একটা নিশ্বাস আপনা হতেই পড়ল। সে ভাবটা চেপে তাড়াতাড়ি বললাম, 'আচ্ছা ভাই, তোমার সঙ্গে আলাপ করা রইল, আমি বোস-সাহেবকে খুব ভালো করে বলব চাকরিটা যাতে তোমার হয়। সেকেণ্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছ ঢাকা থেকে, তোমার আর ভাবনা কি? আর আমাদের গ্রামে যখন এসেছ, একটা না একটা কিছু জুটিয়ে দেবই।'

ছেলেটি একটু হাসল। একান্তই যান্ত্রিক হাসি। এরকম কথা ও নিশ্চয় বহু শুনেছে। তার পর হাত তুলে নমস্কার করে বললে, 'আচ্ছা আসি।' আমি বললাম, 'এসো ভাই।'

ছেলেটি চলে গেল।

দুপুরে বোস-সাহেবের ঘরে গেলাম।

বললাম, 'অত্যন্ত খারাপ অবস্থা স্যার—একেবারে খেতে পায় না এমন দশা—ইস্টবেঙ্গল থেকে এসে একেবারে প্রাণান্তকর অবস্থায় পড়েছে।'

বোস-সাহেবের হেঁড়ে মুখে বেদনার চিহ্ন দেখা গেল; বললেন, 'কি করি বল, মিস্ রায়কে যে আমি কথা দিয়ে দিয়েছি। ওঁর ভাইপোকে চেন তো, সেই যে বুধবার এসেছিল—ওরাও ইস্টবেঙ্গল থেকে এসেছে তো—ওকেই নেব ঠিক করেছি।'

গত বুধবার মিস্ রায় তাঁর ভাইপোকে এনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বোস-সাহেবের সঙ্গে—ফিন্‌ফিনে ধুতিপাঞ্জাবি-পরিহিত সেই উদ্বাস্তুর ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি ছবি—বোস-সাহেবের গাড়িতে পাশাপাশি দুজন—বোস-সাহেব আর মিস্ রায়। বুঝলাম, আমি এখানে একান্তই অবান্তর। উদ্বাস্তু হলেই হল না—তাদেরও জাতিভেদ আছে। মিস্ রায়ের ভাইপো হবার সৌভাগ্য বুড়ীপিসীর ছেলে লাভ করে নি।

মার কাছ থেকে খবরটা পেয়ে বুড়ীপিসীর নির্ঘুম চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়েছিল কি না জানি না। বুড়ীপিসীর ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল একদিন। আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। সেই সামনে এসে দাঁড়াল, বললে, 'কেমন আছেন?' মুখে হাসি, চোখে সেই তীব্র দৃষ্টি।

বললাম, 'ভালো আছি। তোমার খবর কি ?'

ছেলেটি আবার হাসল ; বললে, 'ভালো।'

আটটা-দশে আমার ট্রেন, এটা বালিগঞ্জে পৌছবে নটায়। সেখান থেকে এইট্-বিতে চেপে সাড়ে নটা নাগাদ অফিস। পৌছবার কথা নটায় কিন্তু কোনদিনই তা হয়ে ওঠে না। তবে আটটা-দশ মিস্ করলে অসুবিধার কারণ আছে যথেষ্ট। একদম মিথ্যের চেয়ে তাই আংশিক মিথ্যের আশ্রয়টাই নিলাম ; বললাম, 'আচ্ছা ভাই, চলি ; আবার আটটা-দশ পাব না।' তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম।

কিন্তু আসল কথাটি হল আটটা-দশ ধরা নয়, ওর ঐ হাসি আমাকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মত আঘাত করছিল। আমি তা সহ্য করতে পারছিলাম না।

জীবনধারণের জন্যে কোনরকম সামাজিক বৃত্তিই ঘৃণার্হ নয়। বিশেষ করে যে দেশে জীবনের মূল্য অত্যন্ত কম। যখন ছাত্র ছিলাম, কলকাতায় যখন পড়তে যেতাম কলেজে, তখন দেখতাম ট্রেনে ক্যান্‌ভাসারের বৃত্তিটা বিশেষ একটি শ্রেণীর একচেটিয়া। তার পর চাকরিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রচণ্ড আর্তনাদে সারা দেশ কেঁপে উঠল। পাকিস্তান—দাঙ্গা—উদ্বাস্তু—রিফিউজি। হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশনের দুরবস্থা আমি নিজের চোখে দেখি নি। কিন্তু দেখতে বিশেষ বাকিও কিছু ছিল না। ট্রেনের সেই বিশেষ ক্যান্‌ভাসার শ্রেণীটা দেখতে দেখতে লোপ পেয়ে গেল ; সেখানে এসে দাঁড়াল ভদ্র শিক্ষিত ঘরের ছেলেরা। গলা ফাটিয়ে তারা চিৎকার করতে লাগল—মাত্র দুআনা, কোম্পানি সস্তায় দিচ্ছে মাত্র দুআনা—বাঘ মার্কা হাপ্পাগ, বাঘ মার্কা হাপ্পাগ। অন্তরে সেদিন বেদনা অনুভব করা ছাড়া উপায় ছিল না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে—ওরা তো অসামাজিক কিছু করছে না। বাঁচতে তো হবে।

কিন্তু বুড়ীপিসীর ছেলেকে যেদিন লজেন্স বিক্রি করতে দেখলাম ট্রেনে, সেদিন আমার পিঠে যেন কে চাবুক মেরে জ্বালা ধরিয়ে দিল। আমি সাধারণ একটি মানুষ। পৃথিবীর সব বিরাট বিরাট ব্যাপার—রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান—যাদের পাকচক্রে (পণ্ডিতেরা বলেন) আমরা সব ছোট ছোট মানুষগুলি পাক খেয়ে মরছি, আমি তার কিছুই বুঝি না। কোন্ রাষ্ট্রচক্রের প্যাঁচে পড়ে রূপাই নদীর তীরের এক বুড়ীর ছোট্ট কুঁড়েটি আগুনে পুড়ে গেল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন্ নিয়মে সেই চঞ্চল ছেলেটির সঙ্গিনী ডুবে মরল, আর সাঁতার কাটা ছেড়ে দিয়ে, ডিঙি বাওয়া ছেড়ে দিয়ে, তার জন্মভূমিকে চিরদিনের মত ছেড়ে দিয়ে দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় করে ট্রেনের কামরায় সে ছিটকে পড়ল, লজেন্সের ব্যাগ কাঁধে করে পয়সা নিয়ে বললে—'এক-এক পয়সা, নিয়ে যাবেন,

এক-এক পয়সা'—আমি তার কিছুই জানি না, জানতেও চাই না। কিন্তু এটা আমার নিশ্চিত মনে হল, আমার একটা কিছু করতে হবে, আমার একটা কিছু করা কর্তব্য। হাতদুটো আমার মুষ্টিবদ্ধ হল, অথচ হাতের কাছে কিছু নেই। নিদারুণ লজ্জা আমাকে দারুণ ভাবে আঘাত করল। আমি মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে চাইলাম—ধানক্ষেত যেখানে পেছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে। লজেন্সের গুণগানরত বুড়ীপিসীর ছেলের দিকে তাকাতে আমার ভয় হল, নিদারুণ ভয়—আমি ওর কাছে যেন এক মস্ত অপরাধ করেছি, বিরাট অপরাধ!

কিন্তু তাকাতে একদিন হল এবং সেই শেষ তাকানো।

সেদিন শনিবার। আজও বেশ মনে আছে, আর চিরদিন থাকবে। দুপুর বেলা বাদুড়-ঝোলা হয়ে বাড়ি ফিরছি। যাদবপুরে ভীড় কিছু কমল। একটু বসতেও পেলাম। কতকগুলো রেলওয়ে কনস্টেবল উঠল। আমাদের কম্পার্টমেণ্টে একজন ক্যানভাসার চিরুনি বেচছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে সেই সবে-চলা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে দৌড় দিল। ব্যাপারটা কেমন কেমন লাগতে একজন কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? ও যে অমন করে পালাল? কনস্টেবল বুঝিয়ে দিলে—গাড়িতে এই-সমস্ত ক্যানভাসিং এগুলো বেআইনি। রেল-কর্তৃপক্ষ এগুলো বন্ধ করার জন্যে কড়া আদেশ দিয়েছেন। কনস্টেবলটি একটু এগিয়ে গেল। আমার পাশের ভদ্রলোক বললেন, আরে রাখুন মশাই, ওরা ধরতে পারলে দু-চার পয়সা পায় তাই। আমি উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিলাম। গাড়িটা হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে ব্রেক কষল। আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। দেখলাম সকলে গাড়ির পেছন দিকে চলেছে। আমিও নাবলাম। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হয়েছে মশাই? কি ব্যাপার?'

তিনি 'মার শালাকে' বলে একদিকে ছুটলেন।

'কি হয়েছে মশাই?'—আর একজনকে জিজ্ঞাসা করি।

'একটা ছেলেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।'

'কে', 'কে?'—অনেকগুলো কণ্ঠ প্রশ্ন করে।

'এক শালা কনস্টেবল—তাকে আর আস্ত রাখবে না, যা মারটা দিচ্ছে।'

'কেন', 'কেন'?

'মরে গেছে, না বেঁচে আছে? আরে মশাই, চুপ করে আছেন কেন? ও মশাই?'

'ছেলেটা আমাদের গাড়িতে লজেন্স্ ফেরি করছিল। পাশের গাড়ি থেকে একটা কনস্টেবল সিঁড়ি বেয়ে এসে তাকে অ্যারেস্ট করলে। তা করেছিস কর্, ছেলেটাকে মা-

তা গালিগালাজ করতে আরম্ভ করে দিলে—খোট্টা জানোয়ার তো। ছেলেটাই বা সহ্য করবে কেন? কষে একটা চড় লাগাল মেড়োটার গালে; আর সে ব্যাটাও লাগাল এক ঘুঁষি।'

ততক্ষণে আমি তীরবেগে সেদিকে ছুটেছি। সেদিকে তখন ছুটো ভীড় জমেছে, একটা ভীড়ে কনস্টেবল আর পাবলিকের রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে। একটা ভীড় মৌনমূক হয়ে কেবল দাঁড়িয়ে আছে। আমি লোকের ফাঁক দিয়ে ঠেলে ঠুলে এগিয়ে গেলাম। একেবারে সকলের সামনে গিয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়লাম। কঠিন কালো কালো পাথরের টুকরোর ওপর ছড়িয়ে রয়েছে লাল, নীল, হলদে লজেন্স—মিষ্টি লজেন্স, লিলির লজেন্স—এক-এক পয়সা করে দাম। আর তার মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে বুড়ীপিসীর ছেলে, দু হাত দিয়ে সেই কঠিন পাথরের টুকরোগুলোকে আঁকড়ে—নিশ্চল, নিস্পন্দ। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে রক্ত, লাল টক্‌টকে রক্ত, কঠিন পাথরের টুকরোগুলোকে তারা সিক্ত করে দিয়েছে।

আমি সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। সারাটা সময় কেবল আমার একটি কথা মনে হয়েছে, আমার অযোগ্যতার কথা। একটি ছেলেকে আমি বাঁচাতে পারলাম না। বুড়ীপিসীর ছেলেকে শুধু কনস্টেবলটি একলাই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় নি, সে রাত্রে আমার মনে হয়েছিল আমিও তার ভেতর একজন। পরে অবশ্য উপলব্ধি করেছিলাম, আমার ভাবনার অসারতা কোথায়। কিন্তু সেই রাত্রে আমার বারবার মনে হয়েছিল একটিমাত্র কথা—আমি তাকে চাকরি করে দেব বলেছিলাম। বাঁচার আশ্বাস দিয়েছিলাম। রূপাই নদীর নরম জলে সাঁতার কেটে, আজন্ম-সহচরীর সঙ্গে সেই নরম জলে ডিঙি ভাসিয়ে যার বেলা কাটত, মৃত্যুকালে সে শেষ কথা বলে গেল কঠিন পাথরের কানে। সান্ত্বনা এইটুকু, লাল রক্ত সেই কঠিন পাথরকে ভিজিয়ে দিয়েছিল।

নিস্তব্ধ রাত্রির মাঝে ক্রেপসোলের জুতো পরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে শুনলাম, বুড়ীপিসী কাঁদছে। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে সেটুকু যেন প্রেতিনীর চীৎকারের মত শোনাচ্ছে। বাড়িতে লাশ এনেছে কি না কে জানে! মা আমার জন্যে আলো জেলে বসে ছিলেন। তাঁর চোখেও জল। বললেন, 'এত রাত করে বাড়ি ফিরলি?'

বললাম, 'এমনি।'—তার পর কি খেয়াল গেল বললাম, 'তোমার ছেলে তো তবু বাড়ি ফিরেছে, বুড়ীপিসীর ছেলে যে আর বাড়ি ফিরল না মা—'

মা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

প্রায় মাস তিনেক বাদে একদিন প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝ দিয়ে আসছি। বেলা

দুপুর। বেশ জল-তেষ্টা পেয়েছে। চৌরঙ্গীতে গিয়ে জলও খাব আর কাজও সারব। মাঠের মাঝখানে একটা বুড়ী হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিলে, একটা পয়সা। চলে আসছিলাম। বাড়ানো হাত দেখে দেখে আজকাল অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়েই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমাদের বুড়ীপিসী। সেই ট্রেন-অ্যাক্সিডেন্টের তিনদিন পর থেকে বুড়ীপিসীর আর কোন পাত্তা ছিল না। এতদিন পরে বুড়ীপিসীকে এই শহর কলকাতায় প্যারেড গ্রাউণ্ডের মাঝে দেখব আশা করি নি। বুড়ীপিসীর কাছে সরে এসে বললাম, 'তুমি এখানে বুড়ীপিসী?'

বুড়ীপিসী আমার দিকে তার ছানিপড়া চোখদুটো তুলে খানিক চেয়ে বললে, 'কে? আমাদের যতীন না? তোমাগো কি খবর?'

আমি বললাম, 'খবর ভালোই।—কিন্তু তুমি ওখান থেকে চলে এলে কেন?'

বুড়ী ততক্ষণে বিড়্‌বিড়্‌ করে বকতে শুরু করে দিয়েছে, 'কোথায় যাই, কোথায় যাই, হাড় তো জুড়ায় না, হায় হায়, কেউ নাই কেউ নাই—যতীন, আমার কেউ নাই—'

বুড়ীপিসী কেঁদে ফেলে দিয়েছে।

আমার চোখের সামনে রেললাইনের একটি রক্তাক্ত ছবি ভেসে উঠেছিল। বললাম, 'সত্যি, মানুষে মৃত্যুকামনা এই সময়েই করে—'

বুড়ী কান্না থামিয়ে হঠাৎ যেন তেড়ে আমায় মারতে এল, 'কি কও কি কও—আমি মরমু? ক্যান? ক্যান?' বুড়ীপিসী বিকটভাবে চীৎকার করে উঠল—'আমার সোয়ামীরে খাইছ—হয় নাই? পোলাপানগুলারে খাইছ—হয় নাই? আমারে এবার লইতে আইছ—ক্যান? ক্যান? হাজার বার বাঁচমু আমি, হাজার বার বাঁচমু—আমি বাঁইচ্যা থাকমু, মরুম না, মরুম না, না-না-না—'

প্যারেড গ্রাউণ্ডে বুড়ীপিসীর চিৎকারের প্রতিধ্বনি উঠল।

চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ। সাহিত্য

খুঁজে পাওয়ার শেষে

সাড়ে-ছটার সময় এসেছিলাম, এখন স-সাতটা বাজে।

শশধর বিরক্ত হয়ে বললে, 'দূর! চলো দিদি। ও তুমি কাকে দেখতে কাকে দেখেছ তার ঠিক নেই—সে আজ আসবেও না। চলো, বাড়ি চলো।'

সুনয়নী দেবী ব্যথিত গলায় বললেন, 'আমার পেটের ছেলেকে আমি চিনতে পারব না—এ তুই বলছিস কি শশধর? ও সরোজ না হয়ে যায় না, আমি সব মিলিয়ে দেখেছি,—তেমনি গড়ন, তেমনি চেহারা, মুখ চোখ, মায় ডান গালের ওপরকার কালো তিলটা পর্যন্ত একরকম। আর, ও আসবেই, তুই দেখ্-না। আমি ওকে দুদিন দেখেছি এখানে স্নান করতে আসতে, দাঁড়া-না আর একটু।' সুনয়নী দেবী থামলেন।

তাঁর আবেদনটা করুণ আকুতিতে ভরা বলেই বোধ হয় শশধর আর আপত্তি করতে পারল না, তবে বিরক্ত হয়ে মুখটা আমার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি প্রথম থেকেই নীরব ছিলাম, তাই কিছু বললাম না। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যমনস্কতার ভান করে দশাশ্বমেধ ঘাটের ভীড় দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরেই সুনয়নী দেবী ব্যাকুল গলায় আমাদের ডেকে বললেন, 'ওই দেখ্ শশধর, ওই দেখ্ সুধাকর—ওই যে, ওই আমার সরোজ—'

তাঁর কথাগুলোর শেষ দিকটা উত্তেজনার জন্যেই হোক বা কান্নার জন্যেই হোক, রুদ্ধ হয়ে গেল; তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখটা লাল হয়ে গেছে, আর চোখভরা জল কাঁপছে টল্‌টল্ করে।

তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘাটের দিকে তাকালাম, দেখলাম সুনয়নী দেবীর নির্দেশিত ছেলেটির দিকে: বছর কুড়ি-একুশ হবে বয়স, গায়ের রঙ শ্যাম, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, কাঁধে একটা আধ-ময়লা গামছা, পরনে ঠিক তেমনি একটা ধুতি। আর, আমরা তার ডান দিকেই আছি বলে, ডান গালের ওপর একটা বড় কালো তিল ঠিকই আছে দেখা গেল। স্নানের উদ্দেশ্যেই বোধ হয় ভীড় ঠেলে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে জলের দিকে নামছে।

আবার তাকালাম সুনয়নী দেবীর মুখের দিকে—ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় তিনি তখনও

তাকিয়ে আছেন ছেলেটির মুখের দিকে। চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন একটা ক্ষুধার্তের ভাব—অনেক দিনের অনাহারী লোকের সামনে খাবারের থালা ধরে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকালাম শশধরের মুখের দিকে; সে ভ্রূ কুঁচকে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটির মুখের দিকে,—স্যাকরারা যেমন করে তাকিয়ে থাকে বিক্রী করতে আনা গয়নার দিকে, যেমন করে যাচাই করে জিনিসটা আসল না মেকি, ও ঠিক তেমনিভাবেই যাচাই করছে ছেলেটিকে, দৃষ্টির কষ্টিপাথরে ঘষে যাচাই করছে ওর খাঁটীত্ব।

ওইরকম ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর শশধর ঘাড় নাড়ল আপন মনে। তার পর সুনয়নী দেবীকে বলল, 'না দিদি, এ তোমার সরোজ নয়—হতেই পারে না, কোনো মেড়ো টেড়ো—'

'শশী'—ওর কথায় বাধা দিয়ে আহত কণ্ঠে সুনয়নী দেবী বললেন, 'ওরকম কথা বলিস নে, ও আমার সরোজই, মায়ের দৃষ্টি ছেলেকে চিনতে কখনও ভুল করে?'

'বেশ তো', শশধর যেন একটু বিরক্ত হয়—'ওকে গিয়ে ধরলেই তো হয়, জিগ্যেস করলেই তো হয়, ওর নাম সরোজ কি না। পরিচয় নিলেই তো জানা যায় সব। এসো সুধাকর।'

আমায় আহ্বান জানিয়ে শশধর পা বাড়াতেই, সুনয়নী দেবী ব্যাকুল ভাবে টেনে ধরলেন ওর জামার আস্তিন—'না।'

'না! না কেন?' শশধর এবার একটু অবাকই হয়—'না কেন? ও যদি তোমার সরোজই হয়, তো জিগ্যেস করতে ক্ষতি কি? ওকে তো বাড়িতেই নিয়ে যেতে হবে।'

'না'—সুনয়নী দেবী বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন—'ও আমার বড় অভিমানী; হয়তো দেখাই করবে না, চলে যাবে; তার চেয়ে যেতে দে ওকে—ধরিস নি, আমিই না হয় দেখে যাব রোজ ওকে, সেই আমার সান্ত্বনা।'

ছেলেটি তখন স্নান করে ওপরে উঠে গামছা নিংড়োচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে শশধর বলল, 'তুমি যেন কি, দিদি! পাঁচ বছর যার জন্যে ঘুরছ, ও যদি সেই হয়, ও যদি তোমার সরোজই হয়, তো ডাকতে দোষ কি? হাতে পেয়েও ওকে ছেড়ে দেবে? না, তুমি সরো, আমি দেখি।' শশধর জোর করে সুনয়নী দেবীর হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়; কিন্তু ছেলেটি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। শশধর চলতে

বসন্তবাহার

ভোরের রাতে আকাশের গায়ে শুকতারাটা জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলে। কুহেলি-ঘেরা রাত্রি আস্তে আস্তে সরে যায়, তার জায়গায় ফুটে ওঠে পুবের সোনালি আলো।...

গরিব উঠে বসে। তানপুরাটা কান মুচড়ে বেঁধে নেয়। তার পর ভৈরোঁ সুরে গান ধরে—'জাগো মোহন পেয়ারে।' ঘুমন্ত হিন্দুস্থানীটা একবার পাশ ফিরে শোয়। তার পর গরিবকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দেয়, 'আরে শালা, কেয়া ভোর সে চিল্লাতা হ্যায়।' গরিব গান গাইতে গাইতে উঠে বসে। তার পর রাস্তায় পা দেয়। কলেজ-স্ট্রীটের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করে। ওর সুমধুর গলার গান শুনে কেউ কেউ ওর সামনে থম্‌কে দাঁড়ায়—ওর বাড়িয়ে-দেওয়া ভিক্ষের ঝুলিতে হয়তো দু-একটা পয়সা পড়ে।

বড় রাস্তায় নরম রোদের আলো পড়েছে, কিন্তু অস্পৃশ্যপল্লী গলিগুলো নোংরা ডাস্ট্‌বিন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গরিব একটা গলিতে ঢুকে পড়ে—একটা বাড়ির সামনে থম্‌কে দাঁড়ায়—'মাগো, দুটো ভিক্ষে দেবে?'

একজন লুঙ্গি-পরা লোক বেরিয়ে এসে বলে—'এ বাড়িতে মাও নেই, মেয়েও নেই বাপু, সরে পড়ো বলছি।'

গরিব সরেই আসে সেই অভিশপ্ত গলি থেকে।

আর একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ায়—সুর করে দুটো ভিক্ষে চায়। ভেতর থেকে উত্তর আসে মেয়েলি গলায়—'বাবাঃ, সকালবেলায় বাসি মুখ এখনও ধোওয়া হয় নি, এরই মধ্যে ভিক্ষা। মাপ করো বাপু—'

গরিব আর দাঁড়ায় না সেখানে। বেরিয়ে আসে ওই কানা গলিটা থেকে।

ক্রমশঃ রোদ বাড়ে। জনতার চাপ বাড়ে। গরিব তারই মধ্যে রাস্তার একধারে একটা আসর জমিয়ে তোলে। গুটি-কয়েক শ্রোতা ওর গানের বাহবা দেয়। আর ওর ছোট্ট ঝুলিটা রেজকিতে ঝন্‌ঝন্ করে ওঠে। একসময় আসর গুটিয়ে নেয় পুলিসের গুঁতো খেয়ে। সারপেন্‌টাইন লেনে ঢুকে পড়ে। রোদের তীব্রতা বাড়ে। গানের সুর পালটে যায়—ভৈরোঁ থেকে বৃন্দাবনী সারঙে। ওপাশের বাড়ি থেকে একটা ছোট মেয়ের ডাক ভেসে আসে—'এই, শোনো।'

গরিব এগিয়ে যায়। একটা বছর বারো-তেরো বয়সের মেয়ে ওকে হাতছানি দিয়ে

চলতে ডাকল, 'ওহে, ও ছোকরা'— ছেলেটি শুনতেই পেল না। শশধর ওর কাছে পৌছতে না পৌছতেই সে মিশে গেল জনারণ্যে।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল শশধর বিরক্ত মুখ নিয়ে; বলল, 'না, ধরতে পারলাম না। যাক গে, পরে দেখা যাবে; এখন বাড়ি যাওয়া যাক। চলো দিদি; এসো সুধাকর।'

সুনয়নী দেবী শশধরের যাওয়ার পথের দিকে উদ্বেগাকুল মুখে তাকিয়ে ছিলেন, এতক্ষণে স্বাভাবিক নিশ্বাস ফেললেন। মনে হল, শশধর ছেলেটিকে ধরতে না পারায় তিনি খুশীই হয়েছেন।

আমি একটু অবাক হলাম; কারণ, যার জন্যে সুনয়নী দেবী এই পাঁচ বছর পাগলিনীর মত চারিদিকে ছুটে বেড়িয়েছেন, তাকে হাতের কাছে পেয়েও আটকালেন না, এটা বিস্ময়ের ব্যাপার বই-কি! যাকে দেখা পাবার আগের দিন পর্যন্ত আদর করে ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে উৎসুক ছিলেন, তাকে কাছে পাওয়া মাত্রই দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন, এটাই বা কোন্ কথা? এইজন্যেই বোধ হয় বলে, স্ত্রীচরিত্র বোঝা দেবতাদেরও অসাধ্য কাজ।

সুনয়নী দেবী বোধ হয় আমার অবাক ভাবটা লক্ষ্য করে থাকবেন, তাই কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বললেন, 'ও আমার বাড়ি না আসে ক্ষতি নেই, ওকে যে দেখতে পেয়েছি এইটেই যথেষ্ট, এই আমার মস্ত লাভ; আমি এইটে জেনেই নিশ্চিন্ত হলাম যে, ও আমার বেঁচে আছে।' কথা শেষ করে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেললেন তিনি।

কিন্তু এই কৈফিয়তে ওঁর ওইরকম অস্বাভাবিক ব্যবহারের রহস্যের কোনও কিনারাই হল না, বরং আমি অবাক হলাম বেশী। শুধু দেখা, একটুখানি চোখের দেখার জন্যেই এত আয়োজন, এত পরিশ্রম?

সেই কথাটাই বললাম শশধরকে। 'তা', ও বলল বেশ একটু বিরক্ত হয়েই—'আর বোলো না দিদির কথা; আমিও ভাই এর কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না। এই পাঁচ বছরে কত জায়গায় না ঘুরেছি বলো, দিদির সঙ্গে; দিদির এই খেয়ালের জন্যে পরিশ্রম করে আমারই প্রাণান্ত হচ্ছে। আজ দিল্লী, কাল পাটনা, পরশু বৃন্দাবন,—এই করেই তো পাঁচ বছর কাটল, দিদির এক প্রতিজ্ঞা ছেলেকে খুঁজে বের করে ঘরে ফিরিয়ে আনবেনই। তা, এবারে দিদি বললেন, "চ, কাশীতে যাই।" এটাই বাকি ছিল, তাই তোমার এখানে এসে উঠলাম। আর, ওই ছেলেটিই যদি সরোজ হয়—যদিও আমার বিশ্বাস হয় না, তবুও—তার দেখাও পাওয়া গেল, কিন্তু এ আবার কি উল্টো কাণ্ড কি জানি'—শশধরের গলাটা কোমল হয়ে এল, 'তা, দিদিরও দোষ দেওয়া যায় না। অতবড় ছেলেটা পালাল, তার পর বলতে গেলে, সেই শোকেই জামাইবাবুও গেলেন।

ডাকে। ওর লালচে ফ্রকটা দেখে গরিবের পূর্ব-বঙ্গে ফেলে-আসা তুলতুলে মেয়েটার কথা মনে পড়ে যায়।

'আমাকে ডাকছ মা,' গরিব মেয়েটির দিকে তাকায়।

'তুমি সুরদাসের ওই "রে মন, কৃষ্ণনাম কহ" গানটা একবার গাইবে?' ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। গরিবের মুখটা মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে একজন ছোট্ট গানের সমঝদার পেয়ে। তানপুরাটায় সুর দিয়ে বসন্তবাহারে গানটা গায়। দুই মধ্যমের সুর চারিদিকে অনুরণন তোলে। চড়ার মীড়ের কাজগুলো নিখুঁতভাবে শ্রোত্রীর সামনে তুলে ধরে। গান শেষ হয় এক সময়।

মেয়েটি মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। 'তোমার নাম কি?'

গরিবের মুখটা অকারণে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। বলে নামটা।

মেয়েটি ওর সামনে বাড়িয়ে ধরে একটা দু টাকার নোট। হাত পেতে নেয় গরিব। চলে যায় মেয়েটি।

এর পর ক'টা বছর কেটে গেছে। গরিব আরো গরিব হয়েছে। শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সেদিন তানপুরাটায় কি একটা গানের সুর দিয়ে আনমনে রাস্তা চলছিল গরিব। আগের সে গলা আর নেই গরিবের। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গলাটা বিকৃত আর বেসুরো হয়ে গেছে। হঠাৎ বড় রাস্তার একধারে ওর নজর পড়ে। বিরাট ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। লাল কাপড়ের ওপর রুপালি অক্ষরে লেখা 'বসন্ত-উৎসব'। গরিব ভিড় দেখে থমকে দাঁড়ায়। গেট-কীপারটার কেমন যেন দয়া হয় গরিবের ওপর। গরিবকে ভেতরে ঢোকবার অনুমতি দেয়। গরিব সংকুচিতভাবে একটা কোণে বসে গিয়ে। জলসা শুরু হয়। বড় বড় ওস্তাদরা গান গেয়ে চলেছেন। হঠাৎ একটি সুন্দরী মেয়ে তানপুরাটার তারগুলোর ওপর হাত চালাল। গাইল বসন্তবাহারের ওপর 'রে মন, কৃষ্ণনাম কহ'। গরিবের তন্দ্রাচ্ছন্ন মনটা হঠাৎ জেগে উঠল। কে? কে তার মনের ভাষা জানিয়ে দিচ্ছে? কে? কে? গান শেষ হল। হাত-তালিতে ঘরটা ভরে উঠল। চার-পাঁচটা ফ্লাসিং ক্যামেরা ছবি তুলে নিল মেয়েটির।

তানপুরা হাতে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। মাইকের সামনে গিয়ে বলতে শুরু করল—'আজ আমি আপনাদের গান শুনিয়ে যে পরিতৃপ্ত করেছি, তা আপনাদের হাততালি আর আনন্দপ্রকাশ দেখেই বুঝেছি। আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমি আর একজনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সে হয়তো এখানে উপস্থিত নেই। তাকে

ভেবেছিলাম, পর পর এরকম ছুটো প্রচণ্ড আঘাত দিদি সহ্য করতে পারবেন না, তা—' শশধর থামল একটু, তার পর মৃদুস্বরে বলল, 'তা, দেখলাম, অদ্ভুতভাবে দিদি সহ্য করে নিলেন। এখন যদি মাথায় কিছু'— শশধর আবার থামল, তার পর আপন মনে মাথা নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে বলল, 'কিছুই বলা যায় না, কিছুই বলা যায় না, তাই হয়তো কাকে দেখতে কাকে দেখেছে,—কে জানে।'

বুঝলাম, শশধরের ধারণার গতি অন্যদিকে মোড় ফিরেছে। তা, তাই যদি হয়েই থাকে, তাতে সুনয়নী দেবীকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। ওরকম প্রচণ্ড ছুটো আঘাত পর পর পেলে, মানুষের মাথা খারাপ হতে কতক্ষণ! এতদিন যে সামলে ছিলেন সেইটেই যথেষ্ট।

তা, ছেলেটাও যেন কেমন! পরীক্ষায় ফেল করলে কে না বকুনি খায়? তার জন্যে এতটা রাগ ভাল নয় যে, একেবারে বাড়ি ছেড়ে পালাবে।

অঙ্কে তিন নম্বর শর্ট্ পড়ায় সরোজ যখন ম্যাট্রিক ফেল করল তখন অবিনাশবাবু বকেছিলেন খুব; সুনয়নী দেবী কিছুই বলেন নি, শুধু পাথরকঠিন চোখে তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে।

শশধরও বকেছিল প্রথমে; তার পর বলেছিল, 'যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে, এবার ভাল করে পড়াশোনা করো, যাতে সামনের বারে ভাল করতে পার। এবারের ফেলের বদলে যদি সামনের বারে একটা ভাল রেজাল্ট্ করতে পার, তবেই—'

তা এ-সব কথা আমার শশধরের কাছেই শোনা। আমি আর জানব কেমন করে? কবে ওর সঙ্গে কলেজে পড়েছি, তার পর কতকাল দেখাশোনা নেই; কর্মক্ষেত্রে দুজনে আলাদা হয়ে পড়েছি—আমি কাশীতে একটা কাজ জুটিয়েছি, আর ও কলকাতায় ব্যাবসা আরম্ভ করেছে।

এবারে যখন ও কাশীতে এল সুনয়নী দেবীকে নিয়ে, তার আগেই আমাকে চিঠিতে কিছুটা আভাস দিয়েছিল ব্যাপারটার; আমিও চলে আসতে লিখেছিলাম ওকে। একলা থাকি, তবু একজন সঙ্গী জুটবে; তার পর শশধর ওর দিদিকে নিয়ে চলে এল এখানে। আমার বাড়িতেই ওরা আছে, আমিও সুনয়নী দেবীকে দিদি করে নিয়েছি।

আসবার পর, শশধর আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল।

অবিনাশবাবুর বকুনি বা শশধরের উপদেশ, কোনটাতেই ভ্রূক্ষেপ না করে, সরোজ পরদিন সকালে সবার অলক্ষ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

পারিশ্রমিক দিয়েছিলাম এই গানটা শেখার জন্যে মাত্র দু টাকা, আর আমি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেয়েছি দু শো টাকা। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমি যার কথা বলছি, সে একজন গায়ক-ভিখিরি। কিছুদিন আগেও রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তার গান শুনেছিলাম—বড় বেসুরো, বড় বিকৃত—'

গরিব এতক্ষণ কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল। ওর সমস্ত মনটা কেমন যেন ঝিমিয়ে এল। ভাবল, প্রতিবাদ করবে মেয়েটির কথার। কিন্তু সত্যিই তো, তার গলা বড় বিকৃত, বড় বেসুরো হয়ে গেছে। সত্যিই তো, তার গলা দিয়ে বসন্তবাহারের দুই মধ্যমের কাজ তো আর বেরুবে না। মেয়েটিকে মনে-প্রাণে আশীর্বাদ করল গরিব মনে-মনে। বেরিয়ে এল গরিব ওখান থেকে।

ততক্ষণ আর একজন কে গাইছে, হয়তো সেই মেয়েটিই—'কয়েলিয়া তু মং পুকার।' অন্ধকারে মিশে গেল গরিব।

শ্রীগৌর মুখোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ। সাহিত্য

খুঁজে পাওয়ার শেষে

প্রথমটায় সুনয়নী দেবী ততটা খেয়াল করেন নি, ভেবেছিলেন বেরিয়েছে কোথাও হয়তো, এক্ষুনি আসবে। কিন্তু সেই সকাল যখন ক্রমশঃ দুপুর এবং সন্ধ্যায় রূপান্তরিত হল, তখন হৈ হৈ পড়ে গেল বাড়িতে। শশধরের কাছে খবর গেল। চাকরগুলো চতুর্দিকে খোঁজাখুঁজি করছিল, শশধর এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল; যেখানে যেখানে সরোজের থাকা সম্ভব, সব জায়গাতেই খোঁজা হল, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

সন্ধ্যার পর অবিনাশবাবু অফিস থেকে ফিরলেন। সব শুনলেন গম্ভীর ভাবে, তার পর তিনিও বেরিয়ে গেলেন। সম্ভব অসম্ভব কোনও জায়গাই বাদ দিলেন না—আত্মীয়দের বাড়ি, থানা এবং হাসপাতাল সব খোঁজা শেষ করে বাড়ি ফিরলেন, এবং অসহায় ভাবে দু হাতে মুখ ঢেকে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

সুনয়নী দেবী এতক্ষণ শেষ আশাটুকু নিয়ে একবার ঘর আর একবার বারান্দা করছিলেন, এবারে তিনিও নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

শশধর বিরক্তমুখে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে ছিল, এবার রাগতভাবে বংপরোনাস্তি ধমকাল সে দিদিকে আর জামাইবাবুকে, ছেলেটাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে।

তার কিছুক্ষণ পরে স্বামীস্ত্রীতে কিঞ্চিৎ কলহ হয়ে গেল। সুনয়নী দেবী অশ্রু-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ফেল কি কেউ করে না? তুমি কেন বকলে তাকে অমন করে? সে তো আর ইচ্ছে করে ফেল করে নি!'

অবিনাশবাবু হাতের ঢাকনা থেকে মুখ তুলে বললেন, 'আমিও তো তাই বলি,—ফেল কি কেউ করে না, না তার জন্যে কেউ বকুনিও খায় না যে, তার জন্যে বাবু বাড়ি থেকে পালাবেন রাগ করে? তা নয়—তুমি—তোমার আদরেই ছেলেটা এত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আদর দিয়ে তাকে একেবারে মাথায় তুলেছ তুমি।'

'আমি!' বিছানা থেকে মাথা তুলে কান্না-জড়ানো তবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন সুনয়নী দেবী—'আমি! আমিই শুধু আদর দিয়েছি, তুমি দাও নি? তুমিও কি তাকে প্রশ্রয় দাও নি? নয়তো সে তোমার কথায় রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যায় কোন্ সাহসে শুনি—তোমাকে ভয় না ক'রে?'

'আমি? আমি না তুমি? ওকে একটু বকলে তুমি ছুটে এসে বাধা দাও নি? ওর পক্ষ নিয়ে ঝগড়া কর নি আমার সঙ্গে? সেইজন্যেই তো ও কেয়ারও করল না আমাকে—' অবিনাশবাবুর কণ্ঠস্বর ক্ষুব্ধ।

'আর তুমি?' সুনয়নী দেবী এবার উঠে বসেন বিছানার ওপর—'ওর পরীক্ষার

হারজিৎ

রাস্তার ধারেই বসে ছিল কানাইয়া। ওর বাঁদিকে একটা ভাঙা ঝরঝরে বাক্স, আর সামনে একরাশ ছেঁড়া জুতো। ডান পাশটায় একটা পাত্রে একটু জল। কানাইয়াকে সকলে ডাকে কানু বলে। দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ওকে। একটা গাছের ছায়ায় বসে সেলাই করে। যত রাজ্যের ছেঁড়া জুতোকে কানু নূতন করে তুলছে। পালিশ লাগিয়ে করছে চক্‌চকে, ব্রুশ ঘষে করছে ঝক্‌ঝকে। অপটু হাত, তাই কানু বেশ বাগিয়ে উঠতে পারছিল না। দুটো পায়ের চেটোর মাঝে জুতোটাকে চেপে ধরে ফোঁড় চালাচ্ছিল। ঠোঁট কুঁচকে, চোখদুটো ছোট করে ফোঁড় ঢোকাচ্ছিল চামড়ায়। পর পর অনেকবার বিফল হয়ে এবার সে আমার দিকে চাইল—আমার মুখের দিকে ঠিক নয়, জুতোর দিকে। এরই নাম ব্যাবসা। মালিশওয়ালাদের নজর মাথার দিকে, দর্জিদের খেয়াল পোশাকের দিকে। আবার ড্রাইভার-কোচ্‌ম্যানরা নেতে আছে প্যাসেঞ্জার নিয়ে।

কানু ঠিকভাবে সেলাই করতে করতেই বলে উঠল, 'হাফহুল হোগা জী ?'

বললাম, 'নেহি, দো-চার রোজ হুয়ে বনায়া।' প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ছিল না সময়, তাই এড়িয়ে গেলাম। বাস্‌টা এলেই উঠে পড়ব তাই বললাম 'র‍্যানে দো'।

দাঁড়ালাম বাস্‌-স্ট্যাণ্ডের কাছে। রোদের ঝাঁজ বেড়ে চলল। দাঁড়িয়েই ছিলাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'বাস্‌ আনেকা বহুৎ দের হ্যায় জী।' পিছু ফিরে দেখলাম, কানু আমার পিছনে দাঁড়িয়ে। বড় মায়া হল। বললাম, 'দো মিনিটকে অন্দর পালিশ ক্যর শেকো গে ?'

'কিঁউ নেই ? এক মিন্‌টোমে বানায়েঙ্গে জী।' বলল কানু।

শুরুক্ শুরুক্, ঘস্ ঘস্, ছিক্ ছিক্ অনেক রকম শব্দে কানু পালিশ করে চলল। হঠাৎ দূরে বাসের হর্ন্ শুনলাম। বললাম, 'জল্‌দি বানাও, বাস্ আ গ্যই।' সে নিশ্চিন্ত হয়ে পালিশ করতে করতেই বলল, 'এ বাস্ আপকা নেহি। এ ঠ্যারেগা উধার। এ চাঁদনীচককে লিয়ে।' ও যা বলেছিল তাই ঠিক। বাস্ আমার কাছে দাঁড়াল না। দাঁড়াল অন্য স্টপেজে।

পালিশ করার পর কানু জুতো ফেরত দিয়ে আবার অন্য জুতো সেলাই করতে বসে গেল। পালিশ-ওস্তাদ বটে। যত রাজ্যের নোংরা ধুলোবালি উড়িয়ে দিয়ে জুতোর আসল রূপকে টেনে বার করে আনল। এরা দুনিয়ার নোংরাকে পরিষ্কার করে, ছেঁড়াকে গোটা করে, তবেই পেট ভরায়। কিন্তু কৈ, আমার কাছে পয়সা চাইল না তো ? শুধালাম, 'কিৎনা পয়সা হুঁ ?' জবাব দিল, 'যো মর্জী।'

মর্জী তো প্রচুর ! দু টাকাই দিয়ে দিই ? চার টাকা দিলেই বা ক্ষতি কি ? দশ টাকা দিলে তো আরো ভাল হয় ! ব্যাগটা বার করলাম। একটা টাকা বার করে ওর

আশুতোষ কলেজ
ছাত্র সংসদ্
১৯৫৫

ন, উপরের সারি (দক্ষিণ হইতে বামে)
লদার, কৃষ্ণ চক্রবর্তী (যুগ্ম প্রাচীরপত্র
), সমরেন্দ্র সেন (পত্রিকা সম্পাদক),
য়(কমনরুম সম্পাদক), শ্যামল বিশ্বাস,
চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর ভট্টাচার্য (সংস্কৃতি
সম্পাদক), বরেন্দ্র চৌধুরী

ন, মাঝের সারি (দক্ষিণ হইতে বামে)
ক্রবর্তী (যুগ্ম প্রাচীরপত্র সম্পাদক),
ক্রবর্তী (দীনার্থভাণ্ডার সম্পাদক), কমল
ধ্যায়, গৌতম বটব্যাল, সত্য চট্টো-
রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ
মন্দ্র হালদার, কিশোর রায়, সিতাংশু
্যাপাধ্যায় (সহঃ ক্রীড়া-সম্পাদক)

দক্ষিণ হইতে বামে)—রণেন্দ্র মুখো-
হঃ সভাপতি), অধ্যাপক পরিমল কর
), অধ্যাপক রমেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার (উপা-
জত ঘোষ, পৃথ্বীশ বসু (ক্রীড়া-সম্পাদক)
জ্জল ঘোষ (সহঃ সম্পাদক)

ASUTOSH COLLEGE CRICKET TEAM 1954-55

Winner of Vidyasagar Memorial Shield & Principal S. Roy Memorial Shield
Unbeaten Champion for 1953-54 and 1954-55.

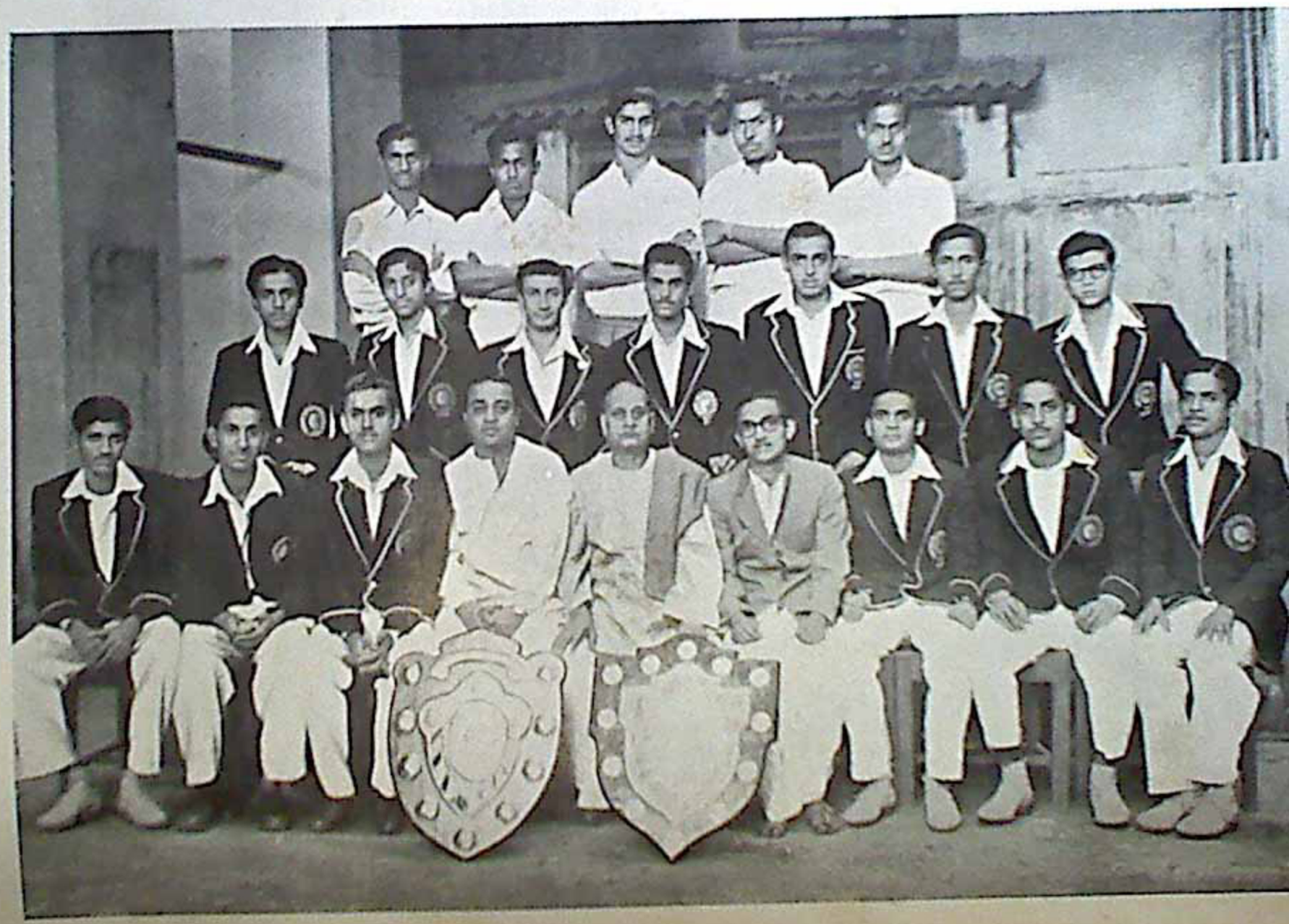

Sitting on Chair (L. to R.)—
K. Bhattacharyya, G. Chakravarti, S. Banerjee*(Vice-Capt.)*, B. N. Chakravarti *(Prof.-in-Charge of Games)*, S. P. Mukherjee *(Principal)*, P. Bose *(Games Secy.)*, S. Roy *(Captain)*, A. Bose, R. Guha.

●

Standing(Front Row L. to R.)
S. Ghose, C. Goswami, A. Sen, D. Dasgupta, V. N. Chaturvedi, D. Bose, A. Maitra.

●

Standing (Back Row L. to R)
S. Banerjee(*Asst. Games Secy.*), S. Das, K. Dasgupta, N. Bose, S. Ghosh.

'আমরাও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' শশধর বলেছিল আমায়—'দিদির ওই কঠিন নিস্তব্ধতা আমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আমরা ভয় পাচ্ছিলাম, দিদি যদি কিছু একটা করে বসে—অবশ্য করাটা কিছু বিচিত্র নয়, ওই বয়সে অমন দুটো শোক। তা আমরা চাইছিলাম, দিদি কোনও কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখুক, বা ওই বাড়িটা ছেড়ে কোথাও যাক। সেইজন্যে আমি একদিন দিদির কাছে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম—তা সে প্রায় ঘটনার মাস আষ্টেক পর। ভেবেছিলাম দিদি আপত্তি করবে; কিন্তু করল না, রাজীই হল; কিন্তু শুধু বেড়াবার জন্যে নয়, বললে, "আমি তাকে খুঁজব শশী, আমি তাকে খুঁজে বাড়িতে আনবই—দেখি সে কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে।" তা আমিও ভাবলাম, মন্দ নয়, ঘোরাই যাক-না কিছুদিন, দিদির মনটাও ভাল হতে পারে, আর সরোজকে যদি পাওয়াই যায় তো ভালই। তাই ম্যানেজারের ওপর কারবারের ভার দিয়ে দিদিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি এই পাঁচ বছর। মাঝে মাঝে কলকাতায় যাই, কাজ দেখি কিছুদিন, আবার বেরিয়ে পড়ি দিদিকে নিয়ে। তা, এই পাঁচ বছরে কত জায়গায়ই তো ঘুরলাম, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না, শুধু কতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ। দিদি মুখে জোর দেখালেও মনে মনে ভেঙেই আসছিল'—ও একটা নিশ্বাস ছাড়ে,—'এই কাশীতে এসেই পাওয়া গেল ওকে—তোমার বাড়িতে ওঠার সাতদিন পর, দশাশ্বমেধ ঘাটেই নাকি দেখতে পাওয়া গেল ওকে।'

শশধর থামল, ভ্রূ কোঁচকাল, তার পর বলল, 'আমি কিন্তু ভাই বিশ্বাস করতে পারছি না সুধাকর, যে, ওই সরোজ।' সে মাথা নাড়তে থাকে আপন মনেই।

শশধরের কথাটা যদিও আমার মনে লাগল, তবুও কেন জানি নে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল—ও-ই সরোজ। বোধ হয় সুনয়নী দেবীর প্রতি সহানুভূতির জন্যেই! বেচারী কত দিনের পর দিন এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন হারানো ছেলের সন্ধানে, অবশেষে যদি ব্যর্থ হন! না না, ও সরোজই হোক।

এর পর থেকে সুনয়নী দেবী রোজই দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে যান, ছেলেটিকে দেখে আসেন; তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আজকাল দেখতে পাই, কেমন একটা সংশয়মিশ্রিত পরিতৃপ্তির ভাব। যেন, হারানো ধন খুঁজে পাওয়ার কঠোর সাধনায় অবিশ্রান্তভাবে সাফল্যলাভ তাঁকে বিস্মিত করেছে; তিনি বিশ্বাস করতেও ভয় পাচ্ছেন যে, এই তাঁর হারানো ধন।

এই ভয়ের চিহ্নের মাঝে যে তৃপ্তির ছটা দেখতে পাই তাতেই আনন্দ পাই, কিন্তু বুঝি না কেন তিনি হারানো ছেলেকে পেয়েও কাছে ডাকছেন না। যা চাওয়া যায়

যৌবন-বোধন

একদিন যে উত্তাল যৌবনের দেখেছি উল্লাস,
শুনেছি প্রচণ্ড বাণী,
—হাস্যদীপ্ত সমুদ্রকল্লোল,
সে কি আজ মৃত স্তব্ধ ?
মনে হয় কখনো তা নয়।
আজ এই যুগসন্ধিক্ষণে
নিজেরে সংহত করি
শুনিতেছে পরম প্রহর !
সমস্ত পুঞ্জিত মিথ্যা,
জীর্ণ স্তূপ নির্লজ্জ পাপের,
সহসা চূর্ণিবে কাল-বৈশাখীর অশনি-নির্ঘোষে !

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
প্রাক্তন ছাত্র

সব সময় তা পাওয়া যায় না বলেই কি তিনি ছেলেকে আদর করে ঘরে ডেকে নিচ্ছেন না—পাছে আবার হারান এই ভয়ে? পেয়ে-হারানোর বেদনা কি চির-হারানোর চেয়ে বেশী? তাই কি তিনি ছেলেকে ঘরে না ডেকে, চোখে-চোখে রাখছেন? ঘরের বাঁধনের চেয়ে কি চোখের বাঁধন বড়? কে জানে—হবেও বা!

ছেলেটার ব্যাপারে মনে মনে বড় কৌতূহল বোধ করছি। শশধর তাকে স্বীকার করে না সরোজ ব'লে, অথচ সুনয়নী দেবীর দৃঢ় বিশ্বাস ও-ই তাঁর ছেলে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগে আমার কাছে; ভাবি ছেলেটাকে একদিন ডেকে এনে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করলে কেমন হয়? সুনয়নী দেবী হয়তো আপত্তি করবেন এই ভয়ে, যদি সে তাঁকে দেখে ভয়ে আবার পালায়। কিন্তু তাকে বাড়িতে এনে যদি একবার ভালো করে বোঝানো যায়, রাখা যায় আদর করে, তবে বোধ হয় সে আর পালাবে না।

সেই মতলবই মনে মনে এঁটে রেখেছি; সুনয়নী দেবীকে জানাই নি, যদি আবার তিনি আপত্তি করেন, বাধা দেন। শশধর এখানে নেই; সরোজকে যখন পাওয়াই গেল তখন আর সে এখানে থেকে করবে কি, সে কলকাতা চলে গেছে, তার অফিস পরিদর্শনে। আর, থাকলেও সে এ ব্যাপারে আপত্তি করত না।

মতলবটা মনে মনেই রেখে দিয়েছি; ধরতে হবে ছেলেটাকে একদিন,—গঙ্গার ঘাটে নয়, সেখানে সুনয়নী দেবী রোজ যান পুত্রসন্দর্শনে—অন্য জায়গায়, যখনি পাব তখনি।

পেয়েও গেলাম একদিন বিকেলবেলায়। একটা ছোট চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় ছেলেটা দোকানে ঢুকল। একটু চঞ্চল হয়ে পড়লাম ওকে দেখে। ছেলেটার ছবি যদিও আমার মনে বেশ করে আঁকা ছিল, তবুও ডান গালের ওপরকার তিলটি পর্যন্ত একবার মিলিয়ে নিলাম। তার পর চা শেষ করে ডাকলাম ছেলেটিকে—'এই, ওহে, শোনো। হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি।'

ছেলেটি বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে এল ও-পাশের চেয়ার থেকে; বলল, 'কি বলছেন বাবু?'

ওর চোখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে জিগ্যেস করলাম, 'নাম কি তোমার?'

'কেন বাবু?'—একটু ভয়জড়িত শোনাল ওর কণ্ঠস্বর।

বললাম, 'বল না, কি নাম?'

'গোবিন্দ'—সেই রকমই ভয়ে ভয়ে ও বলল।

গোবিন্দ! সরোজ নয়! একটু যেন দমে গেলাম—এ তবে সরোজ নয়, গোবিন্দ। আর কথাবার্তার ভঙ্গীটাও তো তেমন—তা নামটা হয়তো ভাঁড়িয়েছে। আর,

বেতার : ১৯৪৩

এক দেহে হল লীন
সাইগন-বার্লিন।
রাতের বেতারে
ছড়ালো কে মুঠো মুঠো কাঁচা প্রাণ ইথারে ইথারে।
মুমূর্ষু ভারত জাগে
বিস্তীর্ণ ভূভাগে,
জ্বালে দীপ
যবদ্বীপ
ইন্দোনেসিয়ায়
এসিয়ায়।

ভূগোল
শুনেছে শুধু দুনিয়ার যত সোরগোল—
সাইক্লোন আসে যায় শতকের বাঁকে—
কে বা মনে রাখে!
পার হয়ে ইতিহাস-ভূগোলের সীমা
লণ্ডন স্টেলিনগ্রাড আর হিরোসিমা
অন্তরনিভৃতে লীন—
দেশহীন কালহীন সাইগন-বার্লিন।

আমার এ ফিকে লাল বুদ্ধির মলাটে
সারাদিন ধুলো জমে দুপুরের হাটে,
বুদ্ধির উজ্জ্বল দিন নিভে গেলে, হলে একাকার,
পৃথিবীতে নামে যেই নরম প্রাণের অন্ধকার,—
তখন মনের খোলা আকাশেতে কার স্বর
উদাত্ত ভাস্বর—
অমলিন
সাইগন-বার্লিন।

অনেকদিন হয়তো আছে এখানে, বাস করছে ওই-সব লোকের সঙ্গে, তাই কথাবার্তার ভঙ্গীটা ওই রকম হয়ে গেছে।

উঠে চায়ের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমার সঙ্গে একবার যেতে হবে বাপু তোমায়।'

গোবিন্দ যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। আমার সামনের ছোট টেবিলটার একটা কোন্ আঁকড়ে ধরে বললে, 'কেন বাবু—আমি—আমি তো কিছু—'

'আরে, না না,' আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম,—'ভয়ের কিছু নেই, চলোই না একটু আমার সঙ্গে, আমার বাড়িতে, মানে—' আমি একটু বুদ্ধি খেলালাম, 'মানে, আমার দিদি তোমায় চেনেন কিনা, তুমি নাকি তাঁর শ্বশুরবাড়ির দেশের লোক, তাই—' কথাটা শেষ না করে একটু হাসলাম ওকে অভয় দিতে। তার পর বললাম, 'চলো হে, এই আধঘণ্টার জন্যে, তার পর চলে যেয়ো। চলো, চলো।'

আমি বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে, গোবিন্দও এল আমার পিছনে পিছনে—একটু ভীতভাবে। আমার কথাটা বোধ হয় বিশ্বাস করে নি। না করুক গে, আসছে এই ঢের। দোকানদারটা আমাদের কথা শুনেছিল, সে গোবিন্দকে সাহস দিয়ে বলল, 'যাও না হে, ভয়টা কিসের? বাবু বলছেন—মেরে তো আর ফেলবেন না তোমায়।' বলে হাসল। ওর কথায় সমর্থন জানাবার জন্যে আমিও গোবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম। ও কিছু বলল না, আমার পিছন পিছন হাঁটতে লাগল গম্ভীর মুখে।

বাড়ির দরজায় ওকে এনে দাঁড় করিয়ে রেখে বললাম, 'দাঁড়াও হে একটু এখানে, দিদিকে খবর দিই।' গোবিন্দ দাঁড়াল; ভিতরে যাবার জন্যে দরজার চৌকাঠের ওপারে একটা পা বাড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম,—'দেখো, পালিয়ো না যেন।' ও'ও একটু হাসল পাংশুমুখে।

ভিতরে গিয়ে সুনয়নী দেবীকে ডাকলাম, 'দিদি, একবার বাইরে আসুন তো।'

ডেকে, আমি বাইরে এলাম। না, গোবিন্দ পালায় নি, দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরে সুনয়নী দেবী হাসিমুখে বাইরের ঘরে এলেন—'কি ব্যাপার সুধাকর, তলব কেন?'

আমিও হাসলাম একটু মুচকে-মুচকে, চালাকের মত, তার পর ঘাড়টা বেঁকিয়ে বললাম, 'বাইরে দেখুন তো একবার।'

'কেন?'

'দেখুন না।'

বেতার : ১৯৪৩

আকাশের কাছাকাছি,
তবু আজো কান পেতে আছি,
কোথায় শব্দের ঢেউ কাঁপে থরথরো—
এরিএল উঁচু করে ধরো ;
খোঁজ করো এই গ্রহ হতে গ্রহান্তরে
কোথায় শব্দের সোনা ফুল হয়ে ঝরে,
সোনার স্তবক খোলো খোলো—
এরিএল উঁচু করে তোলো।

শ্রীদিনেশ দাস
প্রাক্তন ছাত্র

কৌতূহলী হয়ে বাইরের দিকে মুখ বাড়ালেন সুনয়নী দেবী—চোখে পড়ল গোবিন্দকে। আমি হাসিমুখে অপেক্ষা করে রইলাম, তাঁর মুখে হারানো ছেলে ফিরে পাওয়ার হাসি দেখব বলে।

কিন্তু গোবিন্দকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মুখের ভাব পালটে গেল। মুখটা প্রথমে সাদা হয়ে গেল, তার পর লাল হল—বোধ হয় রাগে তিনি কাঁপতে লাগলেন। গোবিন্দর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে একপলক তাকিয়ে আবার গোবিন্দর দিকে চেয়ে চীৎকার করে উঠলেন তিনি—'যা যা, বেরিয়ে যা এক্ষুনি, চলে যা, যা!' বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেঙে পড়ল এবং তিনি দু হাতে মুখ ঢেকে ভিতরের দিকে ছুটে চলে গেলেন।

কি যেন হয়ে গেল! আমি হতভম্ব এবং গোবিন্দ আরও ভীত। তার মুখের দিকে তাকালাম—ভয়চকিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে পকেট থেকে ব্যাগ বের করে একটা টাকা নিয়ে ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'কিছু মনে কোরো না গোবিন্দ, তুমি এখন যাও।'

গোবিন্দ একে ভয় পেয়েছিল, তার পর আবার টাকা দিতে, আরও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে আপত্তি জানাবার চেষ্টা করতেই আমি আবার বললাম, 'না না গোবিন্দ, তুমি নাও, আর যাও এখন।' বলেই আমি বাড়ির ভিতর চলে গেলাম। গোবিন্দ তখনও দাঁড়িয়ে—এবার ভয়ের চেয়ে অবাক ভাবটাই বেশী।

ভিতরে গিয়ে সুনয়নী দেবীর ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা, কোনও সাড়া শব্দ নেই ঘরের ভিতরে। একটু ইতস্ততঃ করে আমি মুখ বাড়ালাম দরজা-পথে। দেখলাম সুনয়নী দেবী বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছেন; কান্নার আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপছে—ফুলে ফুলে উঠছে।

ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার পর ডাকলাম, 'দিদি।'

সাড়া নেই, বোধ হয় শুনতে পান নি। আবার ডাকলাম, 'দিদি।'

এবার শুনতে পেলেন, এবং বিছানার ওপর সোজা হয়ে উঠে বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তীব্র কণ্ঠে বললেন—'কেন, কেন তুমি নিয়ে এলে ওকে? কে বলেছিল তোমায় ওকে ডেকে আনতে?'

কথা শেষ করে আবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন, এবং দেখলাম, নতুন একটা কান্নার স্রোত তাঁর পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

অন্ধকার

বহুদিন আমাকে সে দেখায়েছে নীরবে গোপনে
দিবসের মুক্তা-খচা উর্ণাজাল। দেখায়েছে বক্ষে ব্যথা হেনে অকারণে :
প্রগল্‌ভ দিনের প্রান্তে প্রবীণ তপস্বী অন্ধকার!

তাই আজ দীপময় ঠাণ্ডা-মৃত-রূঢ় সভ্যতার
আবরণ ফেলে অকস্মাৎ
আমার রক্তের চিহ্ন শরে ধরে দেখা দেয় প্রচ্ছন্ন কিরাত
সম্মুখ দিগন্তপটে। ইন্দ্রনীল নক্ষত্র-সন্ধ্যার সমারোহ
সমস্ত আকাশ জুড়ে নিয়ে আসে আমারই প্রাণের উষ্ণ লোহ।
অরণ্যের হিম রাত্রে ভেসে আসে মৃত চাঁদ। শুধু দুর্নিবার
সহস্র পাশব কণ্ঠে তীব্র তিক্ত হয়ে ওঠে অন্তিম চীৎকার!

বহুদিন বলেছে সে : এই তব সুচিহ্নিত ভাবী।
এই সূর্য, স্বর্ণ-রৌদ্র, নম্র মাঠ—এরও আছে তোমার রক্তের 'পরে দাবি!
যে কল্পনা কান্ত তব নিসর্গের সৌন্দর্যসৌরভে—
তিলে তিলে দেহ ঢেলে তারও ঋণ শুধে দিতে হবে।

তাই আজই ভাবি, মনে ভাবি :
যে-আকাশ মাতৃত্বের স্নেহ দেয়, তারও মোর রক্ততরে দাবি?
যে-তটিনী তৃষা হরে, তারও তৃপ্তি শুধুই ছলনে?

নেপথ্যে নায়িকা মোর নূপুরের নমিত নিক্কণে
নিষ্ঠুর সতর্কবাণী উচ্চারণে বারংবার শ্রাবণ-শর্বরী
ব্যর্থ করে। যত বলি, হে দিব্য অপ্সরী,
অনর্গল হাস্যে-লাস্যে চূর্ণ করো রহস্যের অন্ধ-দৃপ্ত এ মূক আসন—
ততবার রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে অকারণ
নক্ষত্রনিশিত রাত্রে মেলে দিয়ে বিষণ্ণ বীণার হাহাকার—
মুছে দেয় মিথ্যা তারা, এঁকে দেয় শান্তমূর্তি প্রবীণ তাপস অন্ধকার॥

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
চতুর্থ বর্ষ। সাহিত্য

কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। সুনয়নী দেবীর লাল মুখ, জল-টলটল্ চোখ, আর তীব্রকণ্ঠের অনুযোগে মুহূর্তের জন্যে বাক্যহীন হয়ে গেলাম ; তার পর বললাম ধীর কণ্ঠে, 'কিন্তু, ও যে আপনার ছেলে দিদি! ওকে পাবার জন্যেই তো খুঁজছিলেন এতদিন।'

'না না না,' আবার উঠলেন সুনয়নী দেবী একটা ছুঁড়ে-দেওয়া তীরের মত—'না, ও আমার ছেলে নয়, কেউ নয়, কেউ নয়। ওর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।'

এবার আর উপুড় হলেন না, তবে দু হাতে মুখ ঢাকলেন ; দশ আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে পড়তে লাগল বিছানার উপর।

কিন্তু এ কি কথা বলছেন সুনয়নী দেবী! ছেলে নয়! কেউ নয়! তবে কেনই বা ওকে দেখে তিনি উতলা হয়েছিলেন অত, কেনই বা রোজ দেখতে যেতেন ওকে, কেনই বা হারানো ছেলে খুঁজে পাওয়ার আনন্দ দেখেছিলাম ওঁর চোখে মুখে? —অস্ফুটকণ্ঠে শুধু বলতে পারলাম, 'তবে যে—'

'জানি তুমি কি বলবে,' মুখ থেকে হাত সরালেন সুনয়নী দেবী। আঁচল দিয়ে চোখ আর মুখ মুছলেন, তার পর তাকালেন আমার দিকে—ফোলা চোখ আর মুখ, এখনও লাল। ভিজে গলায় বললেন, 'জানি তোমরা কি বলবে—কেন তবে আমি বলেছিলাম, ও আমার সরোজ। কিন্তু, উপায় কি সুধাকর!' ভিজে গলা আবার ভারী হল—'পাঁচ বছর ধরে যে আশা আমি বুকের মধ্যে বেঁধে রেখেছিলাম, এখানে আসার আগে বুঝতে পেরেছিলাম, তার ভিত আলগা হয়ে গেছে। মন অনবরত বলেছিল, তাকে আর পাওয়া যাবে না ; কেমন যেন বিশ্বাস হয়েছিল—সরোজ আমার আর নেই।'

ভারী গলার কথা এবার জড়িয়ে গেল, আঁচল উঠল চোখে—'কিন্তু আমি কি করব সুধাকর? সরোজ চলে গেল, উনিও গেলেন, শুধু আমি একা রয়ে গেলাম ওদের শোকের স্মৃতির পাষাণভার বুকে বয়ে বেড়াতে। সে ভার যে কত বড় তা—তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না সুধাকর। সে ভার আমি বইতে পারি না, তবু বইতে হয় ; ভারে আমার নিশ্বাস আটকে আসে, তবু মরি না ; সে যে আমার কত বড় বেদনা, তা তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না সুধাকর।'

সুনয়নী দেবী থামলেন একটু, তার পর অন্যমনস্কভাবে বলতে আরম্ভ করলেন, 'আত্মহত্যা করতে ভয় হয়, তাই মরতে পারি না—মৃত্যুও আসে না, তাই আমায় বাঁচতে হয়, হচ্ছে। কিন্তু'—আবেগে কেঁপে উঠল সুনয়নী দেবীর কণ্ঠস্বর—'কিন্তু কি নিয়ে

সওদা

সবাই যখন ভিড়াবে কূলেতে তরী,
তোমার পালেতে লেগেছে তখন হাওয়া—
কে তুমি চলেছ নাবিক, সে কোন্ দেশে,
সবাই যখন বন্ধ করেছে বাওয়া ?

কোন্ আফ্রিকা-স্বর্ণখনির ডাকে—
কোন্ দারুবনে অভিযান তব শুরু ?
কোন্ ক্যানাডার আকাশেতে কালো মেঘ
ঈশান-কোনায় গর্জিল গুরু গুরু ?

নীল পারাবারে শ্বেত রণপোতে ভেসে
শুভ্র নিশান উড়ায়েছ মাস্তলে।
বণিকেরা চলে লাল তরী বেয়ে জানি—
রক্ত পালেতে হাওয়া লেগে হেলে দুলে।

এ বেশে কোথায় স্থাপিবে রাজ্য তব ?
হে বণিক, দেখো, ভুল কর নি তো ভুলে ?
ইস্পাতে গড়া সারা দুনিয়ার দেশ,
ভিড়াতে কি দেবে তোমার এ তরী কূলে ?

হরিৎ শীর্ষে সোনালি ফসল ফেলে—
শস্যশ্যামল উর্বর তট রাখি'
কোথায় বাহিয়া চলেছ তোমার তরী ?
উপনিবেশ হেথায় গড়িবে নাকি ?

ত্রিরং পতাকা গর্বে উড়ায়ে শিরে
তরী সে চলেছে শুভ্র মেরুর পানে।
সওদা এবার বাণীর কমল-বনে
শান্তির পথে জ্ঞানের সন্নিধানে।

শ্রীসচ্চিদানন্দ সরকার
তৃতীয় বর্ষ। সাহিত্য

আমি বাঁচব, বলতে পার সুধাকর? কোন্ আশায় আমি বাঁচব? কিছুই নেই আমার। তাই তো আমি মনে করতে চেয়েছিলাম, সরোজ বেঁচে আছে, তাকে আমি খুঁজে বের করব। সেই আশাকেই অবলম্বন করে বাঁচতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু শেষ দিকে বুঝলাম, আমার আশা নিষ্ফল, সরোজকে আমি পাব না। কিন্তু তবু মনকে প্রবোধ দিতে পারি কই? তাই কাশীতে এসে প্রথম যখন ওই ছেলেটিকে দেখলাম, তখন মনে করতে চাইলাম, ওই সরোজ। ওর গালের তিলটা ছাড়া আর বোধ হয় কোনও মিলই নেই সরোজের সঙ্গে, তবু মনকে বোঝালাম, ওই আমার সরোজ। মনের সঙ্গে অভিনয় করে আমি নিষ্কৃতি দিতে চাইলাম তোমাদের,—যারা আমার জন্যে ভাব, আর বোঝাতে চাইলাম নিজেকে—ও-ই আমার ছেলে, ওর দেখা পেয়েছি, এবার আমার শান্ত হওয়া উচিত, ঘরে ফেরা উচিত। কিন্তু তাও তো হল না সুধাকর'—সুনয়নী দেবী আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন—'তাও তো তোমরা হতে দিলে না! কেন ডাকলে ওকে তুমি, কেন ডাকলে? কেন তুমি আমার শেষ সম্বল কেড়ে নিলে সুধাকর? এখন আমি কি নিয়ে বাঁচব, আমায় বলে দাও তুমি,—বলে দাও আমি কি নিয়ে বাঁচব।'

বুকভাঙা আর্তনাদে সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটাকে বিমথিত করে সুনয়নী দেবী আছড়ে পড়লেন বিছানার উপর; আর আমি, স্তম্ভিত নির্বাক্ অপরাধীর মত মাথা নীচু করে তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

উষার আগমনে যেমন করে রাতের অন্ধকার ক্রমশঃ ফিকে হতে হতে প্রভাতের আলোয় আকাশটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি করেই সুনয়নী দেবীর সমস্ত আচরণের রহস্য সাদা হয়ে গেল আমার কাছে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, কেন সুনয়নী দেবী ছেলেকে কাছে পেয়েও ডাকেন নি, কেনই বা তাঁর মুখে তৃপ্তির সঙ্গে দেখেছিলাম সংশয়ের ছাপ, আর কেনই বা গোবিন্দকে দেখে তিনি অমন করে উঠেছিলেন।

গোবিন্দর মধ্যে সরোজকে দেখার যে অভিনয় তিনি করেছিলেন, পাছে তা প্রকাশ হয়, তাই তিনি তাকে ডাকতে দেন নি কাছে। এই ভয়ই তাঁকে কাল্পনিক তৃপ্তির মাঝেও সংশয়ান্বিত করত—তারই ছাপ দেখতাম মুখে; আর, গোবিন্দকে দেখে যখন তিনি বুঝলেন, তাঁর আয়োজন সব ব্যর্থ হয়ে গেছে, তাঁর অভিনয় এবার প্রকাশিত হয়ে পড়বে, তখন তিনি ভয়ে রাগে দিশেহারা হয়ে পড়লেন, এবং তার জন্যে দায়ী করলেন সামনে পাওয়া নির্দোষ গোবিন্দকে; তাই তিনি তাকে অমন করে বকে উঠেছিলেন।

মৃতদের দ্বীপ

১৩৬১ সালের কবিতা-প্রতিযোগিতায় প্রথম-পুরস্কার-প্রাপ্ত

কোন মনস্তাত্ত্বিকের উদ্দেশে

হাজারো জনের ইশারা-কাতর
অচেতন এই
লাখো মৃতদের দ্বীপে
অনেক স্থবির ধূসরাভ অভিসার !
নীল-অঞ্জন ভীরু চাহনির ঘন নির্জন প্রসারে
প্রেতায়িত দ্বীপে লোনা ওঠে বারবার।
সে লীন দ্বীপের দেহীদের সত্তায়
সাগর এখনও প্রথম কান্না ঢালে ;—
অথবা অমেয় ঝরাপাতাদের বনে
বেলাভূমি যেন কি এক
চাহনি মেলে।
হয়তো আকাশ যখন মেঘেতে ঢাকা—
উধাও প্রহরী,
উধাও রাতের তারা,—
অনেক অলীক তিয়াসী রাতের কোণে
উত্তাপহীন রাগিণীরা দেয় সাড়া !
বিগত ভোরের
সজলিক মেদুরতা
মুছে দিল বুঝি প্রাক্-দেহীদের কথা !···

শ্রীঅসীম সেনগুপ্ত
দ্বিতীয় বর্ষ। সাহিত

কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে উঠল ; অভিনয়ই যদি করছিলেন, তবে গোবিন্দকে শেষ মুহূর্তে সরোজ বলে গ্রহণ করে শেষ রক্ষা করলেন না কেন ? তা হলে কি সবটাই অভিনয় নয় ? মনের কোণে কি এখনও আশা আছে সরোজকে পাবার ? নাকি, নিজের সন্তানের আসনে অপরকে বসাতে কোনও মা পারে না ? কে জানে !

হোক সবটাই অভিনয়, তবু আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিলাম না। কেবলই মনে হচ্ছিল, গোবিন্দকে ডেকে নিয়ে এসে আমি সুনয়নী দেবীকে দ্বিতীয় বারের মত পুত্রহীনা করলাম, আমার এ অপরাধের শাস্তি নেই ! আমার কানের মধ্যে এখনও বাজছে সর্বহারা নারীর আকুল জিজ্ঞাসা—'বলে দাও, আমি কি নিয়ে বাঁচব ?'

সামনে বিছানার ওপর সুনয়নী দেবীর সারা দেহটা কান্নার আবেগে থর্ থর্ করে কাঁপছে। একটু পরেই কান্না থামবে, সুনয়নী দেবী উঠে বসবেন ; কিন্তু তার পর ? অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের বাঁধন কি ছিন্ন হবে, না বাঁধা হবে আরও জোরে ? নতুনের আরম্ভ, না পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ?

শ্রীপ্রশান্ত পাঠক
প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান

নদ নদী সমুদ্র

যেন তোমারই দুই নিরুদ্দেশ মৃত্যুহাত ধরে
জীবন আর ফুরোবে না, ফুরোবে না—
গানের মালা রাত্রিদিন কেবলই গাঁথা হবে,
ব্যথার ফুল কখনও আর কুড়োবে না।

যেন তোমারই দুই নিরুদ্দেশ মৃত্যুচোখে চোখ
রেখেও বুঝি অনেক জানা বাকি।
মেঘের পটে তুলির রং কেবলই এলোমেলো—
স্বপ্ন তবু সেখানে কেন রাখি।

সে যেন এই আকাশরাঙা মেঘে মেঘে মা গো,
বুকের শিখা জ্বালিয়ে তুলে বলছে হেঁকে হেঁকে—
আমি এলাম পদ্মবীজের কান্না বুকে নিয়ে—
তোমার ধূলি তোমার মাটি মুছিয়ে দেবে কবে ?

সে যেন এই আকাশরাঙা ধূধূ তেপান্তর
সাগর মরু, চিহ্নহীন নদীর তট, পার—
আমার ঘর-দেয়ালে, যার ধুলোর মলিনতা,
সেখানে এসে থামল কেন মা গো।

আবার কাঁকনে তার অন্ধকার মন্দিরের সুর
কেঁপে কেঁপে দুরোজ্জ্বল সূর্যের যন্ত্রনার পানে
তীব্র তীর তুলে ধরে।
পৃথিবীর কাননে কাননে কি মদির কথার আবেশে
ধূলিপদ্ম ফোটে !
রাত্রির রক্তাক্ত হাত ধুয়ে গেল প্রভাতের হ্রদে।

শ্রীউৎপলকুমার বসু
তৃতীয় বর্ষ। বিজ্ঞান

কলম চলেছে

কলম চলেছে লেখকের।
দিনরাত্রির অন্তহীন কাজ বেয়ে
নিত্য উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায় স্বপ্ন।
তার চুম্বনে অধীরা যে হিয়া!
* * হায়! কোথা সেই নির্জন তীর?
সেই শৈবালবাহী হতস্রোতা?
মর্মর গুঞ্জরনের কানাকানি নিকুঞ্জের?

পলাশতলে যাত্রা-শেষের অবসর কই?
কই গোধূলির ভাবাচ্ছন্নতা?
রাগালের ক্লান্ত পরিক্রমণ?
তবু কলম চলেছে লেখকের—
একান্তে অক্লান্তে পাষাণের অলিন্দে।
আয়াসলব্ধ অবসর তার নেই।
সে সংসারী, নিত্যকার কর্মে বাঁধা।—
তবু, কলম চলেছে লেখকের।

ঘুমাচ্ছন্ন সহস্র আঁখির পাশে
রাতের নক্ষত্র-ইচ্ছা সে।
সৃষ্টি তার চাই;—
হায়! উৎস কই?…
ব্যর্থ সন্ধানী স্বপ্নাবেশে মগ্ন হল।
* * এখানে পাষাণ দাঁড়িয়ে,—
অভিশপ্ত অহল্যার কঠিন হৃদয়ের হ্যাজভার।

কলম চলেছে

এখানেই দাঁড়িয়ে সেই স্রষ্টা,
সৃষ্টির ইচ্ছায় যে উদ্ধত,
দারিদ্র্যের রিক্ত ঝুলি হাতে তার।
উন্মেষের নবতর স্বপ্ন কই ?
তবু, ধূধূ-তপ্ত জীবনের
বালিয়াড়ি-অন্তর্লীন ফল্গুধারা বেয়ে—
কলম চলেছে লেখকের।

শ্রীবাসুদেব গুপ্ত
প্রথম বর্ষ। বিজ্ঞান

প্রতিবেদন

নূতন ছাত্রাবাস

আবাসিক জীবন ছাত্রজীবনের একটা অনন্য মুহূর্ত। এ'কে পুরাকালের গুরুগৃহে রূপান্তরিত সংস্করণ বলা চলে। এখানে যে এক নূতন আলো পাওয়া যায় তা অনস্বীকার্য। তাই ছাত্রজীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায় আবাসিক জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে। আশৈশব ছাত্রাবাসেই আমার অবস্থান, বহু ভালমন্দ অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি সত্য। কিন্তু এর মধ্যে বর্তমান বৎসরের আবাসিক জীবনের প্রীতিমধুর অভিজ্ঞতা আমার জীবনে অবিস্মরণীয় ঘটনা ও ভাবীকালের পাথেয়।

ট্রাম্‌লাইন থেকে একটু দূরে শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে আমাদের ছোট্ট ত্রিতল ছাত্রাবাসের অবস্থান। আভ্যন্তরীণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা গৃহটিকে করেছে মনোরম। অতি আধুনিক বাহ্যিক আড়ম্বর না থাকলেও গৃহটি সব দিক থেকে চিত্তাকর্ষক। এখানে আবাসিকগণের পরস্পর সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বমূলক। যেন একই পরিবারের কয়েকটি সন্তান। অধীক্ষক মহাশয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালন-ব্যবস্থা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে করেছে সুসংহত ও সুষম, মাধুর্যমণ্ডিত। তাঁর অকৃত্রিম সাহচর্য আমাদের দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির ভিত্তি।

গতানুগতিকভাবে এ বছর ছাত্রাবাসে স্বাধীনতা-দিবস, নেতাজী-জন্মতিথি আড়ম্বরহীনভাবে প্রতিপালিত হলেও, ছাত্রাবাস তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। উৎসবানুষ্ঠান আমাদের ছাত্রাবাসের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার বিশেষ রূপ। এবারে বড়দিনের ছুটি একেবারে ব্যর্থ হয় নি। বহুদিন ধরে ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ যা কেবল কল্পনা করে গেছেন, তা এবারে পরম সার্থক রূপ নিয়েছে। বাংলার একমাত্র সুদৃশ্য সমুদ্রসৈকত দীঘায় ভ্রমণ এবার আর নিছক কল্পনায় পর্যবসিত না হয়ে বাস্তব হয়ে উঠল আবাসিকগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতায়। আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সহাধ্যক্ষ শ্রীরমেন্দ্রনাথ সরকার, অধীক্ষক শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য, প্রিয় অধ্যাপক শ্রীশিবনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীসুনীলকুমার সিদ্ধান্ত, অধ্যাপক শ্রীপরিমল কর, অধ্যাপক শ্রীকান্তীশ মাইতি, অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার দাশ এই অভিযানে যোগ দিয়ে এ'কে আরও উৎসাহিত

আনন্দমুখর করে তুললেন। ছাত্র ও অধ্যাপকদের এতবড় সম্মিলিত অভিযান ছাত্রাবাসের ইতিহাসে এই প্রথম। নির্দিষ্ট দিনে প্রায় পঞ্চাশজন যাত্রী হাওড়া স্টেশন থেকে কাঁথি-অভিমুখে যাত্রা করলেন। সন্ধ্যায় খড়গপুর স্টেশনে পৌঁছে কাঁথিগামী বাস ধরে রাত দশটার পূর্বে সবাই কাঁথি শহরে পৌঁছলেন। ছাত্ররা সবাই অবস্থান করলেন কাঁথি ক্লাবে আর অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকরা কাঁথির স্বনামধন্য ভূস্বামী শ্রীসতীশচন্দ্র জানা মহাশয়ের আমন্ত্রণে রাত্রি যাপন করলেন তাঁর বাড়িতে। তার পরদিন ভোরে দীঘা রওনা হয়ে সকাল আটটায় দীঘায় পৌঁছলেন। পূর্ব হতেই দীঘায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র জানা, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দীন্দা ও উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় মহাশয়দের তিনটি বাড়ি ঠিক করা ছিল, তাতে আশ্রয় নিলেন সবাই। ছাত্র ও অধ্যাপকদের এই প্রীতি-মিলনে এবং দীঘার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সান্নিধ্যে সমস্তদিন এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করা গেল। দুপুর ও রাত্রে আহারের বেশ ভাল ব্যবস্থাই ছিল। পরদিন ভোরে সমুদ্রসৈকতে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখে কাঁথির দিকে রওনা হলেন, কারণ পূর্ব থেকেই কাঁথি কলেজের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে প্রীতি-সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। কাঁথিতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ আমাদের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের অভিনন্দিত করার জন্য কলেজে নিয়ে গেলেন। যথাসময়ে উভয় দলের ক্রীড়াবিদ্‌রা মাঠে নেমে গেলেন। উভয় দলের খেলা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়েছিল, মাঠের চারদিকে দর্শকের ভীড়ও বেশ হয়েছিল। কাঁথি কলেজের খেলোয়াড়রা বেশ ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখালেও বিজয়ের সম্মান আমরা পেলাম। এইবার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকরা ওখানকার ৺অমূল্য দীন্দার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলেন আমাদের প্রাক্তন আবাসিক শ্রীহরিশচন্দ্র জানার সৌজন্যে।

এই-সমস্তের মূলে যিনি অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন, কাঁথি কলেজের সেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুশেখর পণ্ডার ঋণ অপরিশোধ্য; এবং আমাদের প্রিয় অধ্যাপক ডাঃ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও ছাত্রবন্ধু শ্রীঅবনীভূষণ করণ, শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, শ্রীনিমাইসুন্দর জানা, শ্রীসুবিমল দাশ, শ্রীদিলীপকুমার প্রামাণিক ও প্রাক্তন আবাসিক শ্রীদুলাল দাস প্রভৃতি যাঁরা আন্তরিক সহযোগিতা করে আমাদের এই অভিযান সফল করেছেন তাঁদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

দীঘাভ্রমণ ছাড়াও ছাত্রাবাসে অনেক কিছু ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে 'ওল্ড হস্টেলের' সঙ্গে আমাদের ফুটবল খেলা স্মরণীয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যই সেদিন আমাদের খেলোয়াড়রা এক গোলে পরাজিত হয়। কিন্তু ক্রিকেট খেলায় আমাদের

ক্রীড়াবিদ্‌রা তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। এ বছর আমাদের ডাকে 'ওল্ড হস্টেল' ক্রিকেট খেলায় যোগ দিয়ে প্রীতি-সম্মেলনকে সফল করেছেন। তাঁদের খেলোয়াড়রা কোন অংশেই আমাদের চাইতে নিকৃষ্ট নন। তাঁদের ক্রীড়ানৈপুণ্যকে সাধুবাদ না দিয়ে পারি না। উভয় দলের খেলা যে বেশ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ওঁদের খেলোয়াড়রা মাত্র '৬৯' রানে আউট হয়ে যান, অন্যদিকে আমাদের খেলোয়াড়রা '১৩০' রানে আউট হয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। এ ছাড়াও আমরা অন্যান্য কয়েকটি সংঘের সঙ্গে খেলে অনুরূপ সম্মানলাভ করেছি। অধীক্ষকমহাশয় ও ক্রীড়াবিভাগের সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি সেন আন্তরিকতা ও শ্রীদিলীপকুমার দাশগুপ্তের সংগঠনী শক্তি ও আগ্রহ আমাদের খেলাধুলার উন্নতি ও সাফল্যের সহায়ক।

এর পর আমাদের ছাত্রজীবনের সব চাইতে আকাঙ্ক্ষিত উৎসব সরস্বতীপূজা বেশ শ্রদ্ধা-স্নিগ্ধ পরিবেশে ও ধুমধামের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবানুষ্ঠান আরও বৈচিত্র্যময় ও মধুর হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন শিল্পীর সান্নিধ্যে। শিল্পীদের এইরূপ সাহচর্য আমরা চিরদিন পাব আশা করি। এই অনুষ্ঠানে শ্রীআলোক হালদার, শ্রীবিমলাংশু মহাপাত্র, শ্রীনবকুমার কর, শ্রীঅসিত নাগের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরেও প্রাক্তন-আবাসিক-পুনর্মিলন উৎসব পূজার পরদিন প্রাতে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকগণ ও অধিকাংশ প্রাক্তন আবাসিক উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন আবাসিকগণের অন্যতম শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের দরদ-ভরা গান সেদিনের পরিবেশকে এক নূতন রূপ দিয়েছিল। সে পরিবেশ কোনদিন ভুলবার নয়।

ছাত্রাবাসের ছোট্ট গ্রন্থাগারটির এ বছর কোন বিশেষ উন্নতি না হলেও গ্রন্থাগারিক শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের নৈপুণ্যে সুদৃশ্য ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আশা করি এর উন্নয়নের জন্য পরবর্তী বন্ধুরা বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

গত বছর আমাদের আবাসিকগণের ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার ফলাফল বেশ আশাপ্রদ। বি.এ. ও বি.এস্‌সি. পরিক্ষার্থী এগারো জনের মধ্যে দশ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের তিন জন 'ডিস্‌টিংক্‌শন্' ও এক জন অনার্স সহ পাশ করেছেন। শ্রীদুলাল দাস ইউনিভার্সিটিতে বাংলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে হস্টেলের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। আই.এ ও আই.এস্‌সি. পরীক্ষার্থী তেরো জনের মধ্যে দশ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে চার জন প্রথম বিভাগে।

প্রতিবেদন

ছাত্রাবাসের প্রত্যেকটি কাজে অধীক্ষক শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহৃদয় দৃষ্টি তো আছেই, অধিকন্তু কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রেরণার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি। আশা করি এঁদের এই আশীর্বাদ আমাদের উত্তরোত্তর উন্নতির সহায়ক হবে। এঁদের জানাচ্ছি আমার ভক্তিযুক্ত অভিনন্দন। আর যাঁরা আমার কর্তব্য সম্পাদনে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন তাঁদের জানাই আন্তরিকতা এবং যে-সমস্ত বন্ধুরা আগামী বি.এ, বি.এস্‌সি. এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁদের জানাই শুভেচ্ছা। ইতি

শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ দাশ মহাপাত্র
সাধারণ সম্পাদক,
আশুতোষ কলেজ নূতন ছাত্রাবাস

কমন-রুম

কমন-রুমের ভার নেবার পর প্রায় এক বছর কেটে গেল। এখন সময় এসেছে আমার দায়িত্বের হিসাবনিকাশ দেওয়ার। আমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবার চেষ্টা আমি করেছি, কিন্তু ঠিক সফল হয়েছি কি না তার বিচারের ভার ছাত্রবন্ধুদের উপর।

এর উন্নতির জন্য অনেক কিছু করবার আশা ছিল কিন্তু প্রধানতঃ স্থানাভাবেই তা করতে পারি নি। এতবড় একটা মহাবিদ্যালয়ের এত অল্পপরিসর কমন-রুম সত্যই দুঃখের কথা। কলেজে কমন-রুমের প্রয়োজন খুব বেশী, কিন্তু তাতে যদি সব ছাত্রদের ইন্‌ডোর গেম্‌সে খেলতে দেওয়া না যায় তবে কমন-রুমের অর্ধেক আনন্দই নষ্ট। কথাই আছে, Common-room for common students—এবং তার সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা খেলাধুলা ও পড়াশুনার মাধ্যমে।

ইন্‌ডোর গেম্‌সের ভাল ব্যবস্থা নেই সত্য, কিন্তু আমাদের এখানে প্রায় সকল রকম পত্রিকা রাখা হয়। স্বাস্থ্যান্বেষী ছাত্রদের 'ব্যায়াম' নামক মাসিক পত্রিকা দিতে পেরে আমি আনন্দ বোধ করছি। এবার কমন-রুমের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকাগুলি যাতে তাড়াতাড়ি না ছিঁড়ে যায় তার জন্য কভারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নূতন টেবিল-টেনিস বোর্ড বসাবার কথা অনেক চিন্তা করেছি কিন্তু স্থানাভাবেই তার কিছু করা গেল না। একটা বোর্ডে এত ছাত্রের খেলার চাহিদা মেটানো যায়

না সত্য, কিন্তু বৃহত্তর কমন-রুম যতদিন না হচ্ছে ততদিন অসুবিধা ভোগ করতেই হবে। গতবারের মত এবারও গ্রীষ্মাবকাশের পর আমাদের টেবিল-টেনিস ও ক্যারম খেলার প্রতিযোগিতা শুরু হবে। সম্ভব হলে দাবা খেলারও একটি প্রতিযোগিতা হবে।

খেলাধুলা ও সাময়িক পত্রিকা পড়া ছাড়াও কমন-রুমের আর-এক দিক আছে, সেটা গল্পের বই পড়া। আমাদের গল্পের বই কম; সাড়ে তিন হাজার বই দিয়ে তিন হাজার ছাত্রকে তুষ্ট করা যায় না। এবার কিছু বই কেনা হয়েছে কিন্তু তাতেও হয়তো সম্পূর্ণ চাহিদা মিটবে না। আশা করি তাঁরা আমার অক্ষমতার কারণ বুঝবেন।

অন্যান্য বছর আমাদের আন্তঃ কলেজ টেবিল-টেনিস ও ক্যারম প্রতিযোগিতায় আমাদের সফলতার কথা বলা হয়, কিন্তু এবার আমরা কিছুই করতে পারি নি। আমরা টেবিল-টেনিসে আর. জি. কর মেডিকেল ও ক্যারম সেমি-ফাইনালে নীলরতন মেডিকেল কলেজের কাছে পরাজিত হয়েছি।

সর্বশেষে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে যে-সমস্ত বন্ধুরা আমাদের কাজে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিভাগীয় আযুক্ত অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় সর্বদাই আমাকে সঠিক পথে চালিত করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

শ্রীআশীষকুমার রায়
সেক্রেটারি, কমন-রুম

কৃষ্টি-পরিষদ

আমার হাতে কৃষ্টি-বিভাগের ভার আসিবার পর আসিল নেতাজী-জন্মোৎসব। নেতাজী-জন্মোৎসব বেশ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল। তার পর সরস্বতী পূজাও ভালভাবে সম্পন্ন হয়।

গতবারে বাৎসরিক মিলনোৎসব উপলক্ষে তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' নাটকটি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। এই নাটকে যাঁহারা নিপুণভাবে অভিনয় করেন তাঁহাদের নাম—অমর, গৌরমোহন, সলিল, প্রবীর, ওঙ্কার, বিজন, সমর, সুপ্রিয়, সজল, অনন্ত, উদ্দালক প্রভৃতি। অধ্যাপক শ্রীসুনীল সিদ্ধান্ত মহাশয় পরিচালনা করেন।

এই বৎসর আমাদের কলেজের শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায় সংগীত-প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ যুব সম্মেলনে কলেজ হইতে এইবার প্রতিনিধিদল যাইবে এবং ঐ সম্মেলনেও আমাদের কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

এই বিভাগের উন্নতির জন্য প্রত্যেক ছাত্রের সহযোগিতা কাম্য। আমরা এই বিভাগের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

বসন্ত-উৎসব

গত ৮ই এপ্রিল মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং শ্রীসুনীলকুমার সিদ্ধান্ত মহাশয়ের পরিচালনায় ও মাননীয় অধ্যাপক শ্রীপরিমল করের ব্যবস্থাপনায় কৃষ্টি-পরিষদের উদ্যোগে আমাদের এবারের বসন্ত-উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রীসুজিত ঘোষ দৈহিক ক্রীড়াকৌশলে, শ্রীসুধীর সেন সংগীতে, শ্রীঅরিন্দম বাঁশিতে এবং শ্রীসলিল গীটারে সকলকে মুগ্ধ করেন। এর পর আরম্ভ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। এই নাটকে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি ছাত্র এমন কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন যে তা দেখে দর্শকগণ মুগ্ধ হয়ে যান। বিশেষতঃ তিনকড়ির ভূমিকায় সলিল রায়, বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় অমর মুখোপাধ্যায়, কেদারের ভূমিকায় অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঈশানের ভূমিকায় প্রবীরকুমার ভট্টাচার্য যেরূপ পারদর্শিতা দেখান তা সত্যই প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় দিলীপ, শ্যামল ও দীপক মোটামুটি অভিনয় করেন।

যাঁরা এই বসন্ত-উৎসবে সহযোগিতা ক'রে এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীপ্রবীরকুমার ভট্টাচার্য
সম্পাদক, কৃষ্টি-পরিষদ

রবীন্দ্র-পাঠচক্র

রবীন্দ্র-পাঠচক্রের পরিচয় দেবার বিশেষ প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের পূর্বে যিনি এই রবীন্দ্র-পাঠচক্রের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন তিনি এ বিষয়ে সবিস্তারে বলে গেছেন। রবীন্দ্র-পাঠচক্র আমাদের কলেজের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা। সাহিত্যালোচনা এবং সাহিত্যের প্রচারই এর একমাত্র উদ্দেশ্য। ভাবী লেখকদের উৎসাহ-কেন্দ্র এটা।

এ বছর আমাদের এই সাংস্কৃতিক সংস্থার যাত্রা শুরু হয় ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে। নিম্নলিখিত ভাবে এবারের কর্মপরিষদ গঠন করা হয়।

সর্বাধ্যক্ষ—অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়; সহকারী সভাপতি—শ্রীদীপ্তিপ্রসাদ মিত্র; সম্পাদক—শ্রীসুখেন্দু মোদক; সহকারী সম্পাদক—শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য; এবং 'লিপিকা'-সম্পাদক—শ্রীসমীরণ দাশগুপ্ত ও শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্ত।

সভ্যবৃন্দ॥ শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীস্বরাজ রায়চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীরমেন হালদার, শ্রীগৌতম সান্যাল, শ্রীমানস ভট্টাচার্য, শ্রীউৎপল বসু, শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীপিনাকীরঞ্জন সেন, শ্রীশৌর্যব্রত রায়চৌধুরী, শ্রীসত্য চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গাশংকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চাকলাদার, শ্রীকিশোরী রায়, শ্রীতপন রায়চৌধুরী।

এবারে এ পর্যন্ত আমরা নিয়মিত 'লিপিকা' প্রকাশ করেছি। রবীন্দ্র-পাঠচক্রের মুখপত্র হিসেবে 'লিপিকা'র কলেজের মধ্যে বেশ সুনাম আছে। এর পিছনে আছে লিপিকা-সম্পাদক শ্রীমলয়শংকর দাশগুপ্তের অপূর্ব সৃজনী-প্রতিভা। রেখায় লেখায় তাঁর হাতে 'লিপিকা' অনবদ্য রূপ নিয়েছে—এক কথায় কলেজের প্রাচীরপত্রগুলির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন এনেছে তাঁরই তুলির অপরূপ বৈচিত্র্য। পাঠচক্রের সভাপতি, সংসদ-সভাপতি, অধ্যাপক ও ছাত্র-বন্ধুদের উপস্থিতিতে সাফল্যজনকভাবে 'লিপিকা'র উদ্বোধন করা হয়। স্থানাভাব-বশত লিপিকা প্রকাশে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়; এ বিষয়ে আমরা ছাত্র-সংসদের সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কার্যভার গ্রহণে বিলম্ব এবং কলেজের আনুষঙ্গিক ছুটি-ছাটা থাকার দরুন গ্রীষ্মাবকাশের আগে কোন সাহিত্যসভা ডাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে অবকাশের পর আমরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হব এবং আমরা কবি-সম্মেলন, সাহিত্য-সভা, বিতর্ক-সভা প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে রবীন্দ্র-পাঠচক্রকে আরও প্রিয় করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব।

রবীন্দ্র-পাঠচক্রের তরফ থেকে আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানাই যাঁদের উৎসাহ আমাদের এ শুভ কাজে ব্রতী হতে সচেষ্ট করেছে; আর স্মরণ করি স্বর্ণদিগন্তের সেই শুভক্ষণটিকে যখন অভ্যুদয় হয়েছিল সেই মহাকবির।

শ্রীসুখেন্দু মোদক,
সম্পাদক, রবীন্দ্র-পাঠচক্র

যোগাযোগ-সমিতি

ছাত্রদের মধ্যে অনেকে গৃহশিক্ষকতা চান, আবার অনেক ছাত্রের বাড়িতেও ভাই-বোনদের জন্য গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয়। দুই দলের যোগাযোগ সাধন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমরা কলেজ পত্রিকার পক্ষ হইতে যোগাযোগ-সমিতি নামে একটি ক্ষুদ্র সমিতি গঠন করিতেছি।

যিনি গৃহশিক্ষক হইতে চান এবং যিনি গৃহশিক্ষক পাইতে চান উভয়েই সমিতির নিকট যথাযথ বিবরণ-সহ স্ব-স্ব অভিপ্রায় জানাইয়া আবেদন করিবেন। আবেদনপত্র-সমূহ সংকলন করিয়া শিক্ষক এবং শিক্ষকতা-প্রার্থী আবেদকদের একটি করিয়া নামতালিকা প্রস্তুত করা হইবে। এই তালিকা দেখিয়া উভয়দলের প্রার্থীর মধ্যে মিলন ঘটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইবে। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় স্বহস্তে এই কাজের ভার লইতে সম্মত হইয়াছেন। এ সম্পর্কে সকল জ্ঞাতব্য তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

আবেদন-পত্র নিম্নলিখিতরূপে পূরণ করিয়া পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট দিতে হইবে। যিনি নিজে শিক্ষক হইতে চান তিনি পূরণ করিবেন 'ক' পত্র। আর যিনি গৃহশিক্ষক নিয়োগ করিতে চান তিনি পূরণ করিবেন 'খ' পত্র।

'ক'-পত্র

১। আবেদনকারীর নাম। রোল নম্বর। শ্রেণী। সেকশন
২। ঠিকানা
৩। কোন্ শ্রেণীর ছাত্র পড়াইতে চান
৪। কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ অধিকার আছে
৫। কত পারিশ্রমিক আশা করেন
৬। আবেদনের তারিখ

'খ'-পত্র

১। আবেদনকারীর নাম। রোল নম্বর। শ্রেণী। সেকশন
২। ঠিকানা
৩। কাহার জন্য শিক্ষক আবশ্যক। কোন্ শ্রেণীর ছাত্র
৪। কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য আবশ্যক
৫। কি পারিশ্রমিক দিতে চান
৬। আবেদনের তারিখ

কলেজ পত্রিকা প্রদর্শনী

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা সমিতির উদ্‌যোগে কলেজ-পত্রিকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে। এই প্রদর্শনীকে সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য আমরা পশ্চিম বঙ্গের সকল কলেজের অধ্যক্ষ, কলেজ-পত্রিকার পরিচালক এবং ছাত্র-সম্পাদকদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

যাঁহারা এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করিতে চান, তাঁহারা অধুনা (১৯৫২ হইতে ১৯৫৫ এর মধ্যে) প্রকাশিত স্ব স্ব কলেজ-পত্রিকার প্রতি সংখ্যার দুই কপি করিয়া পত্রিকাধ্যক্ষ ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা-২৫—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। ঐ সঙ্গে পত্রিকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণগুলিও জানাইবেন :

১। পত্রিকাটি প্রথম কবে প্রকাশিত হয়

২। বৎসরে কয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়

৩। পত্রিকার আকার এবং পৃষ্ঠা-সংখ্যা

৪। বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধের সংখ্যা কত? গল্পের সংখ্যা কত? কবিতার সংখ্যা কত?

৫। বর্তমান সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীর রচনা কত পৃষ্ঠা

৬। বর্তমান সংখ্যায় অধ্যাপকদের রচনা কত পৃষ্ঠা

৭। বর্তমান সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীর আঁকা ছবি কয়খানি

৮। বর্তমান সংখ্যায় ছাত্রছাত্রীর তোলা ফোটোগ্রাফ কয়খানি

৯। বিজ্ঞাপন লওয়া হয় কি না

১০। বিশেষ জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকিলে

Asutosh College Magazine

Professor-in-charge
DR. BIJANBIHARI BHATTACHARYA
Editor
SAMARENDRA SEN

ASUTOSH COLLEGE ROWING TEAM.
1954-55

Standing (*L to R*) R. P. Chatterjee, A. Chatterjee, K. Bose, A. Banerjee, A. Banerjee
Sitting on Chair (*L. to R.*) D. Ghosh, B. N. Chakravarti (*Prof-in-Charge of Games*), P. K. Bose (*Games Secy.*), K. Ghosh (*Captain*).

Dr. AJIT KUMAR ROY,
M.Sc. (*Cal.*), Dr. rer. nat (*Gottingen*)

Justice Sri Ramaprasad Mookerjee M.A., LL.B.
President of the Governing Body of our College

ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

A message from our President

My young friends,

you have been repeatedly reminded that the education imparted in your Institution will be an incomplete one unless you are fully and properly equipped to become useful members of a progressive Society. Qualifying yourselves for the different University or College tests is one of the means for obtaining recognition but is not the end in itself.

To repeat the words of
Swami Vivekananda

"What I want is muscles of
iron and nerves of steel, inside
which dwells a mind of the same
material as that of which a
thunderbolt is made — Strength
— Manhood — Kshatra Viryya
plus Brahma-Tej."

May you prove yourselves
worthy of the high ideals of the
Great Founder of this College.

19th May 1953. Ramaprasad Mookerjee

EDITORIAL NOTES

I look upon it as a pleasure and a privilege to be able to present the thirtieth issue of our College Magazine to our student friends, patrons and well-wishers.

At the very outset we must express our profound sense of sorrow and grief at the passing away of Sri Jibanananda Das, Sri Jatindranath Sengupta and Sri Karunanidhan Bandyopadhyay. They were three distinguished poets of Bengal. Bengali literature suffers an irrepairable loss in their death. We offer our tearful homage to the memory of these departed poets.

The death of Sri Satindranath Sen of Barisal, under tragic circumstances, brings to a close the glorious career of a noble patriot and a valiant fighter for freedom. His elevating idealism, his passionate love for his country, and his indomitable spirit inspired hope and faith in the millions of people belonging to the minority community in East Bengal. In their hour of trial he proved to be a tower of strength to them. His was a dedicated life. He lived and died for his country. Our countrymen will for ever cherish with reverence the memory of this great son of Bengal.

With the death of Sir Alexander Flemming humanity loses one of its greatest benefactors for all time to come. His discovery of penicillin is a splendid contribution to the science of medicine. It is a wonder drug par excellence. Like Prometheus of old he seems to have stolen for the second time the fire of life from heaven for the suffering humanity. Millions of diseased, wounded and dying people all over the world now owe their lives to penicillin.

Another great calamity has befallen mankind. Einstein is dead. A giant among scientists has fallen. In him the world witnessed a finest flowering of human genius. He was decidedly one of the greatest thinkers and scientists of all times. He

bestrode the world of scientific thought like a colossus. He possessed a cosmic mind. He was the father of Nuclear Physics. He upset all other ideas about space and time by propounding his epoch-making Theory of Relativity. He was the first scientist to realize the existence of the tremendous energy that lay dormant in the atom. He was, however, a man of peace and a great lover of humanity. The insane craze for multiplying atomic weapons, that he found rampant among the great powers of the world, filled his mind with deep anxiety and darkened the closing years of his life.

Our salutations to these great scientists who have by their contributions definitely raised the stature of man.

This year the Nobel Prize for literature was awarded to Ernest Hemingway for his novel, *The Old Man and the Sea.* In this book he has left the beaten track ; he has made a masterly survey of a fisherman's life.

An announcement has been made to the effect that Sri Tarasankar Bandyopadhyay and Sri Rajsekhar Bose have been awarded the Rabindra Puraskar of the year for their books, *Arogya Niketan* and *Krishna Kali Ityadi Galpa* respectively. We welcome this announcement with all our heart and offer our sincere felicitations to these great litterateurs of Bengal.

During the last Puja vacation a number of students from our College joined a youth leadership training camp at Kamarpukur organised at the instance of the Government of West Bengal. The students who participated from our College were Samiran Chakravorty, Dipak Banerjee, Sankarlal Chakravorty. and Monotosh De. Prof. Parimal Kar and Prof. Kalyan Mukherjee joined this camp as leaders. The opening of such camps is certainly a move in the right direction.

We are glad to know that Sri Ajay Kumar Ghose who passed his B. A. Examination from the Asutosh College in 1953 and is now studying for the Bar at the Lincolns Inn,

London, has been elected General Secretary of the Inns of Court Students' Union, London. This Union is an Association of students from all parts of the world studying for the Bar examinations having for its object the promotion of the interests of Bar students. Sri Ghose was previously a member of the Asutosh College Students' Union.

We congratulate the Vice-Chancellor and the Syndicate of the Calcutta University for the very wise decision of granting permission under certain conditions to external students to appear at the I. A., B. A. and B. Com. Examinations as private students.

I should now like to place before our College authorities some of our urgent needs. First of all I must stress the necessity of a larger Common Room for the relaxation and recreation of students. The present Common Room cannot accommodate even a fraction of the total number of students in our College.

The College canteen is also too small to provide accommodation to a large number of students at a time. A bigger room should be allotted for the canteen.

Considering the growing importance of science it has become an imperative necessity that tutorial classes should be introduced in science subjects at the earliest convenience.

I fervently hope that the College authorities would kindly consider these modest requirements of the students and take early steps to make necessary provisions for them.

It must be admitted on all hands that our College Union with all its defects has done something to foster the spirit of unity among the students of our College. Minor differences should never be allowed to affect this basic spirit of unity. In future, whenever we happen to differ, we should make it a point to sit round a table and try to compose all these differences in an atmosphere of friendship and cordiality.

We are very grateful to Prof. Suresh Chandra De for his invaluable services to our College Magazine. We offer our tribute of respect to this great friend of ours.

These notes will remain incomplete if I fail to acknowledge with gratitude the kindness and sympathy, active help and co-operation that we have received at every stage from our Vice-Principal Ramendra Krishna Sarkar, Prof. Amiya Ratan Mukherjee, Prof. Nirod Kumar Bhattacharya, Prof. Parimal Kumar Kar, President of the College Union, Prof. Jitendra Nath Chakravarty, Prof. Debabrata Mukherjee, Prof. Sisir Kumar Das, Prof. Amar Mitra and Prof. Biswa Nath Chakravarti. We are particularly grateful to Prof. Chakravarti for the photographs printed in our sports page. As I conclude these notes the name of our beloved Principal Sri Someswar Prasad Mukherjee naturally comes uppermost in my mind. His parental solicitude for our College Magazine has proved to be an abiding source of inspiration to us. Whenever we are confronted with a dilemma it is the light of his wisdom and experience that guides us and helps us to find a solution.

We have spared no pains to make our College Magazine worthy of its great traditions. We shall deem our labours amply rewarded if our friends find something in it that they can read with interest and pleasure.

Samarendra Sen Gupta
Editor

REPORTS

The report of the Debating Section

As the Secretary of the Debating Section of the Students' Union, I had the pleasure and privilege of organising a few debates among the students both in English and in Bengali. Due to a number of holidays on account of the University Examinations, we could not hold debates more frequently. We hope to have them in increased number after the Summer vacation.

During the year 1954-1955 Sri Arun Mitra and Sri Dilip Kumar Chakravarty (in English), and Sri Dipti Prasad Mitra and Sri Dipak Bhattacharya (in Bengali) were sent to parti-

cipate in the inter-collegiate Debating Competition organised by the Calcutta University Institute and in these debates Sri Dipti Prasad Mitra stood second in order of merit. We also sent certain other students to participate in different competitions. We know that we have not been able to do much but with active co-operation and sympathy of our fellow students we hope to do more.

I express, in conclusion, my deep sense of gratitude to Prof. Nirod Kumar Bhattacharya and to Prof. Parimal Kar, the President of the students' union, who have always helped us in our endeavour.

Dipak Bhattacharya
Secretary, Debating Section

Report of the Students' Union

The new Secretary takes over :—The charge of the Students' Union was made over to the present General Secretary in November, 1954.

Netaji's Birth-day :—We observed the birth-day of Netaji Subhas Chandra Basu in collaboration with the unions of the Evening and Morning Departments. The programme was simple but impressive. Principal S. Mukherjee hoisted the national flag and Principal K. Sen was the chief guest.

Saraswati Puja :—The Saraswati Puja constitutes the greatest cultural function organised by the Students' Union. This year the ceremony, which came off on the 28th January, was performed with great pomp and pageantry jointly by the Students' Unions of the three Departments.

Games and Sports :—The College Cricket Team has maintained the glorious tradition of the last year. This year also we have become the proud winners of the Inter-Collegiate League and Principal S. Roy Memorial Shield. The College team has won the Inter-Collegiate Championship in Basket-Ball. We have also won the Inter-Collegiate Knock-out Regatta this year by defeating the St. Xavier's College. Our Annual Sports were held on the 20th and 21st January, '55, in our College-ground, under the presidentship of Principal S. Mukherjee.

Our achievements in the sphere of games and sports augur a brighter future for the College. This year our College is the proud winner of Inter-Collegiate Championship both in Body Building and Weight Lifting. The college also won the Championship in Inter-Gymnasium Body Building Competition organised by Kidderpore Byayam Samity. The credit for all these achievements goes to Sri S. Ganguly.

Music :—This year Sri Kamal Banerjee of our College won the individual and College Championship in Inter-Collegiate Music Competition. It is specially noteworthy that he stood first in all the items. We wish him a glorious future.

The report will remain incomplete without a reference to the debt of gratitude that the union owes to Principal S. P. Mukherji. He has been a most zealous guardian of the rights and privileges of students. We also express our gratitude to our president, Prof. P. Kar, for having guided the activities of our Union with remarkable ability.

Sujit Ghosh
General Secretary

The report of the Students' Union Poor Fund

It is about a year since the charge of the Students' Union Poor Fund was entrusted to me. It is a matter of deep regret that we could not offer any aid to the poor examinees this year.

It gives us much pleasure to announce that we have adopted a resolution to set up an old-book store to help the poor students who are unable to meet the full cost of the books. We do hope to give effect to this resolution in the coming session. We appeal to all examinees, who will come out successfull, to contribute their old books to the proposed old-book store.

We acknowledge our deep sense of gratitude to Prof. Parimal Kar, the President of the Students' Union, for his kind guidance to make fruitful the above new scheme. It is for the first time in our college annals that this scheme will be taken up. I also convey my thanks to all students, specially to the members of the union, who have given their kind suggestion either orally or in writing.

We propose to collect money for Poor Fund in the first week of every month. If this drive is continued for some months, we shall be able to form a Poor Fund of our own. Success of this venture depends upon the co-operation of the general students of this college. We have also decided to arrange a charity film show during the first week of May '55 or after the Summer vacation.

In conclusion, we do hope to get approval of the Governing Body for installation of a permanent Poor Fund. So, we, the members of the union, appeal to the Governing Body, especially to the president, Sri P. Kar, and principal Sri S. P. Mukherjee, who take a keen interest in our union, to grant some amount from the union budget for the Poor Fund.

Dilip Kumar Chakravarty
Secretary, Poor Fund.

Asutosh College Economic Society

To promote the knowledge of Economics and politics among the students of this college, Asutosh College Economic Society has been formed. Its main aims and objects are to arrange debates, lectures, study circle, etc. It also seeks to publish fortnightly or monthly pamphlets. All students interested in Social Science are requested to join the Society.

An executive committee has been duly formed by students of Economics of the Third Year Class. Prof. Sibnath Chakravarty has kindly consented to be the first President of the Society. The following have been elected members of the executive committee :

Probodh Krishna Das Mahapatra, Souryabrata Roy Chowdhury, Baren Chowdhury, Sukhendu Modak, Shibapriya Mukherjee (Secretary).

Principal S. P. Mukherjee has kindly consented to be the patron of the Society.

Shibapriya Mukherjee
Secretary, Economic Society

PROBLEMS IN PRESENT-DAY PHYSICS

The concepts in the realm of science, Physics in particular, that were prevalent since the time of Newton, had undergone considerable changes with the advent of the 20th century.

In the year 1900, Max Plauck had revolutionised the whole world in explaining the black-body radiation by introducing the idea of discrete nature of energy and new concept of exchange of energy between matter and radiation. Thus Plauck states that energy is atomic in nature and that emission and absorption of radiation do not take place continuously, as was believed by classical theory, but in discrete quanta. Einstein goes further and assumes that radiations travel through space not in waves but in bundles or packets of energy now known as light quanta or 'protons'. The quantum theory is able to explain the photo-electric effect, the variation of specific heats of solids with temperature and, above all, the atomic Spectra. Side by side with the quantum theory, developed another branch of physics, the relativistic mechanics, which is due to Einstien. Special and general theory of relativity replaced the Newtonian mechanics, and many deductions therefrom have since been verified experimentally.

Though the relativity theory was firmly established by 1920, serious challenge had been made against the quantum theory by the exponents of the wave theory of light, because, the wave theory could explain diffraction, polarisation, interference etc., which the quantum theory could not. Thus physics had faced the dilemma of explaining certain things by the wave theory and certain other things by the quantum theory.

Along with the quantum mechanics developed a new branch of mechanics known as the wave mechanics for mulated by De Broglie and Schrœdinger. This new concept had its germ in the idea of De Broglie, that the same dualism of wave and corpuscle as is present in light also occurs in matter. A material particle will have a matter wave associated with it, just as a light is both corpuscular and wavy in nature. The basic idea of quantum mechanics was put forward by Heisenberg in 1927, a logical deduction of which is that, it is impossible to measure

accurately both the position and momentum of a particle simultaneously, and the errors are given by $\Delta p.\ \Delta q. \backsim h$ where 'h' is the Plauck's Constant, Δp—the error in determining the position and Δq—the error in determining the momentum. This is Heisenberg's uncertainty principle. Quantum mechanics has explained very satisfactorily the atomic physics.

In the field of the nuclear physics, i.e, physics of the nucleus, quantum mechanics was applied too. Though in many cases the quantum mechanics have been able to explain satisfactorily the results, and have made important predictions, it is in the field of nuclear physics that the quantum mechanics has not fully succeeded in explaining the phenomena of α-decay. Moreover physics is still unable to decide whether the particles—electrons, positrons, protons, neutrons and mesons should be classified as fundamental or not. Are neutrinos to be added to the list or not ?

Many physicists expect the answers to these questions to come from a proper blend of the theory of relativity and quantum mechanics. The methods in use at present relate practically to the one-body problem only, and fail when applied to processes involving several particles in rapid relative motion. Many of the contemporary physicists believe that this cannot be solved until a proper quantum field theory is developed.

Disbeliefs in the fundamental principle of quantum mechanics are expressed by many leading physicists including Einstien and Schrœdinger. Einstien cannot believe that "God plays dice with this universe." He is trying to build up unified field theory in which gravitation and electro-magnetic theories are amalgamated into one field theory. Schrœdinger is trying to interpret the universe in terms of waves. Dirac is thinking of reviving the 'Ether'.

This is the condition of present-day physical theories. It is very difficult to predict the future course which physics will take.

Ram Mihir Sen
Third Year, Science.

THE STUDY OF SANSKRIT

The Indian people represent the best form of human species. This is no vain glory. The outlook of the common men of India and the philosophy of life they follow will prove beyond doubt their supremacy over their contemporaries. Indian people and culture were subjected to many intrusions from time to time, but the inherent qualities and richness of their own religion, philosophy and culture had helped them to survive these ordeals successfully. The cultural tradition of India is both historic and scientific. The idea of one world, which has become the live talk of the modern generation, also owes its origin to Indian philosophy. The trend of Indian culture has always been international and it never provided any scope for parochial outlook to gain ground. For instance, when India was politically divided, it was our culture and philosophy of life that preserved the fundamental unity of the land.

But to know our culture and tradition one must needs learn Sanskrit, the language of the land. Because, it was in Sanskrit and Sanskrit alone that Indian culture and philosophy found their true expression. Indeed, if anyone wants to know anything about our culture and religion, there is no other way than to learn Sanskrit.

In free India the importance of Sanskrit is undoubtedly very great. Sanskrit has ever been the vehicle of our age old Indian culture and we cannot maintain our link with our cultural heritage if we do not know something of the language wherein the wisdom of ancient India is expressed. It is admitted on all hands that Sanskrit, which is the mother of almost all the Indian languages, is one of the best and sweetest tongues of the world.

W. Jones says that "the Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure ; more perfect than Greek, more copious than Latin and more exquisitely refined than either..."

Even certain other Aryan languages have their origin in Sanskrit. To an Indian it is not merely a language rich in words

but a language through which he can receive his moral and spiritual directives. Time is now ripe enough to revive the ancient culture of India. The new India ought to grow on her own tradition and culture. Sometime ago President Dr. Rajendra Prosad said that the study of Sanskrit was a *sine qua non* if we were to be loyal to our heritage of culture. It is no exaggeration to say that in Sanskrit literature is embodied the very soul of India. We are indeed very much fortunate inasmuchas we have inherited from our ancestors a grand treasure-house of knowledge and we should see to it that we make the best use of it. Mahatma Gandhi once wrote: "No Hindu boy or girl should be without a knowledge of the rudiments of Sanskrit if he will imbibe the spirit of his religion. Sanskrit has undoubtedly helped our country to preserve its religious and cultural integrity. It has been the main factor which has contributed most to India's unity in diversity." In a recent speech at Ahmedabad Prime Minister Sri Jawaharlal Nehru said: "Sanskrit was at one time a most powerful language depicting the high altitudes our people had reached; but it is a pity that three to four hundred years back the language had ceased to evoke the strength which it used to". (Hindusthan Standard, 8-1-55).

It is a matter of regret that even many educated persons of our country are sometimes found to remark that Sanskrit is of no use to the students in their after-life. But the fact remains that man cannot live by bread alone and this is specially true in our country where people are religious by nature. Our religion again is inextricably bound up with this sacred language. No nation can prosper neglecting its own culture and religion. Sanskrit, therefore, cannot be buried in oblivion, as then the very roots of Indian culture would wither away. A great scholar named Mons Dubois says in his "Edinburgh Review" that at one time Sanskrit was the one language spoken all over the world. Really, Sanskrit is to Indian culture and tradition as the body is to the soul. An exquisite container of an excellent and effulgent culture and tradition, Sanskrit is the best disciplinarian of the soul, as admitted by Max Muller, W. C.

Taylor, Prof. Wilson, Dr. Allen, Sir William Hunter, Sir Monier Williams and other savants both of the East as well as of the West. Absence of Sanskrit, in whatever stage of a student's life it may be, may not atrophy our tongue, but it will certainly asphyxiate the heart and brain. So the observation that Sanskrit is a dead language is far from being true. To the dead it is dead. It was not dead to Acharya Prafulla Chandra who engaged Sanskritists to learn Sanskrit and embody his researches in "The History of Hindu Chemistry." It was not dead to Sir William James, George Foster, Goethe and a number of other westerners. We should certainly develop a taste for Sanskrit which is in our blood and which we must be proud to call our own.

It is indeed a pity that this great language, which happens to be the key to our philosophy and religion, has been deliberately murdered by a constant and careful administration of the poison of English education for two centuries, and the present Sanskrit animus is begotten of an Anglofilia which ought to have been a thing of the past by now. Now that the iron-chains of slavery have been torn asunder, it is certainly the duty of the educational authorities all over India to rise to the occasion and teach the students of the country to learn and love a thing that is their own and that happens to be a unique store-house of real knowledge and wisdom. Our regional language, namely Bengali, has had a very close affinity with Sanskrit and it must be plain even to the meanest intellect that any time devoted to the study of Sanskrit can serve only as an aid to the development of our regional languages. It is a matter of immense satisfaction that Sanskrit is studied in several Universities of Europe and Japan. The Americans also appreciate the Sanskrit culture of the Hindus. Recently a Sanskrit Dictionary has been published in Russia. Besides India, Sanskrit is studied in other Asian countries. Even the Afgans are resuscitating this so-called 'dead' language. It is a compulsory subject in Kabul University. Researches in Mysore have unearthed the æronautical science hitherto lying entombed in Sanskrit. The world-renowned German philo-

sopher Schopenhaueer once wrote: "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishads. It has been the solace of my life and it will be the solace of my death." No education, as a matter of fact, can be considered perfect which does not develop the body, mind and soul. Sanskrit education undoubtedly makes education perfect. I would here refer to the admirable Chapter IX, "The Place of Classics in Education" of Prof. Alfred Whitehead's book entitled "The Aims of Education." The following quotations will bear out the fact that this famous classical language has been held by some eminent European scholars to be richer than both Latin and Greek:

"The three representatives of the Faculty of Science energetically urged the importance of classics on the ground of its value as a preliminary discipline for scientists."

"In classics we endeavour by a thorough study of language to develop the mind in the regions of Logic, Philosophy, History, and of æsthetic apprehension of literary beauty. The learning of the languages—Latin or Greek—is subsidiary means for the futherance of their ulterior object."

Now that we are reorienting our system of education as part of a general endeavour to make the common man more acquainted with our culture and spiritual heritage, it is certainly all the more important that Sanskrit ought to become an essential part of liberal learning. The great medico-turned Sage, Swami Sivananda, in his "Sure ways for success in life and God realization," has spoken very highly of this language which constitutes, as it were, the corner-stone of the edifice of our culture and tradition.

In conclusion, I would like to state that the study of Sanskrit should be intensified in our Universities, and at the same time the teaching should be made more simple and attractive, so that we students may evince a living interest in the subject. Sanskrit is a door that opens straight to paradise.

Amal Kumar De
First Year, Arts.

COLOURS FROM BARKS OF TREES

The coloured matters from various trees can be extracted and may be solidified by industrial process. These colours, when dissolved in water, will give the characteristic pigments and these shades will remain permanent.

The dyes, as they are called, are of many types and the colour of the dyes depends upon certain colour-bearing groups as stated by Witt (1876). For exmple :
$-N=O$, $-N=N-$; $>C=C<$; $= <\!\!=\!\!=\!\!=\!\!>$; $-NO_2$ etc.

Before Witt the theory of quinonoid structure was responsible for colours in dyes. But Witt showed that the quinonoid structure was nothing but a special type of *Chromophore.* The above-mentioned groups are called *Chromophoric Groups.*

But there are certain compounds which are not coloured yet which contain such groups ; again some compounds having no such groups are coloured. Benzene (C_6H_6), for exmple, contains $>C=C<$ group, and is colourless. Azomethane ($CH_3.N=N.CH_3$) too, is colourless. Indigo has blue colour but has no chromophoric group. All these are honourable exceptions. The compounds containing the chromophoric groups are known as *Chromogen.* The groups which function as dyes are known as *Auxochrome* or the colour-bearing group, the commonest of which are $-NH_2$ and $-OH$. Others are $-NHR$, $-NR_2$, $-COOH$, $-HSO_3$.

Auxochromes may be either basic or acidic in nature. There are also certain other groups known as *Bathochrome* which help the deepening of colours and which have an opposite effect known as *Hypsochrome* groups. The change of colours from greenish yellow → yellow → orange → red → purple → violet → indigo → blue → greenish blue → green is known as deepening of colours. Halogen atoms usually possess a mild bathochromic effect.

Experimental

The solidification of colours

The colours derived from the barks of trees may be solidified by the following process. Here I shall describe a particular case with the barks of *Bakul* trees.

The barks (dried and *not separated* from the woody portions) weighing approximately 15 grms are taken in a beaker and covered wholly by 200 ml. of water and kept for 20 hours. Then filtered and the filtrate is evaporated to reduce the volume to 30 ml. when some solid residue (a portion of dye) separates out. The mother liquor is then boiled with 30 grms of sodium chloride (common salt) for 2 to 4 minutes and immediately cooled in ice bath, and when the temperature reaches about 5°C it is filtered in a filter pump washing the residue by cold water whereby the excess of sodium chloride is removed. The residue on the filter paper is then again recrystallised from hot water, and then dried in a desiccator overnight.

Yield approximately 10 grms.

The loss due to recrystallisation of the weight due to woody portions comes into this operation. Hence the yield is rather poor.

Lala Shyama Prosad Sinha
Fourth Year, Science

DO YOU KNOW

1 Why does oil burn so easily ?

All oils consist of a very large amount of the two elements, Carbon and Hydrogen, and many oils contain a certain amount of Oxygen, but no oil contains enough Oxygen to satisfy the Carbon and Hydrogen atoms in them. If the Hydrogen is to be fully burnt, every two atoms of it need one of Oxygen, as in water, which the chemists call H_2O. If the Carbon is to be fully burnt, every atom of it needs two atoms of oxygen which is Co_2. So due to the presence of Hydrogen and Carbon oil easily burns in Oxygen till it is completely oxidised.

2 Is smell a wave in the air ?

Smell is not a wave in the air. The great point about smell and taste, which go together, is that they are what are called contact senses. They are due to the actual touching of the tongue or part of the nose by particles of certain kinds. We can smell at a distance because the tiny parts of the thing that has the smell have actually travelled through the air and reached the nose. So smell is not a wave in the air.

3 Why does a boy's voice break and not a girl's ?

When a boy's voice breaks, it is because his voice-box is suddenly becoming rather larger. As a girl grows up to be a woman, her voice-box grows steadily in proportion to the rest of her body. But for some reason Nature prefers that men shall have much deeper and louder voices than women. In order that this shall be so, the larynx, or voice-box, must be larger in proportion, and the vocal cords longer, in men than in women.

4 What is the sun made of ?

In early days scientists discovered the presence in the sun of certain things quite different from the elements known upon the Earth. One of these was Helium, but this light gas has

since been found on Earth, and it has also been discovered that the other things are not really different but are behaving differently on account of the great heat of the sun. Thus the sun does contain the same elements as the Earth.

5 How the telephone keeps a message till a man comes home ?

Such an invention was made by the Danish engineer Poulsen, who discovered that if an iron wire is slowly passed near a telephone magnet while some one is speaking, it will register the electric impulses of the telephone, and if such a wire is afterwards run through a similar reproducing device, the words will be repeated as in the gramophone.

6 What is the hole in the pen-nib for ?

Ease and rapidity in making the up and down stroke in writing require, in addition to fairness, a certain degree of flexibility in the point of the pen, and, therefore, all pen-nibs have a slit running to the point from a little hole cut in the middle of the nib where it begins to taper. If a nib had no slit its point would stick in the paper and cause the ink to splatter. The curvature of the nib permits it to hold a fair amount of ink, and the film that forms across the hole prevents the ink from running down and making a blot.

7 What is stable equilibrium ?

Equilibrium is balance, and by stable equilibrium we mean balance which is not easily disturbed and which tends to recover itself if it is disturbed.

8 Why do we grow old ?

This is a most difficult question, which some of the wisest men find difficult to answer. The chief reason seems to be that gradually there heaps up in our bodies a certain amount of the waste products of our lives. We get rid of most of these

quite easily, especially the gaseous ones, like carbon-dioxide or CO_2. But there are others which we do not completely get rid of, and at last they poison us, make our limbs and joints stiff, our hair fall out or turn grey, our skin shrivel, and so on.

9 Could a stone be dropped through a hole through the earth ?

If it were possible to dig a hole right through the Earth, a stone dropped through this hole would fall with ever-increasing speed, because gravitation would drag it towards the centre. The resistance of the air would, however, limit the speed of the stone. It would rush past the centre, because the tremendous velocity it had acquired would carry it onward, but now gravitation as well as air resistance would be slowing it down until it came to a momentary stop, when it would return to the centre and go beyond ; and the process would be repeated until eventually it became stationary at the centre of the earth.

10 How many waves are there in a beam of Light ?

The number of waves a second in a beam of light varies according to the colour, but whatever the colour they are numbered by millions of millions. The violet rays have nearly twice as many waves a second as the red. Here are the numbers of waves a second for some of the colours :

Red, 400 million millions ; Orange, 437 million millions ; Yellow, 509 million millions ; Green, 570 million millions ; Blue, 696 million millions ; Violet, 750 million millions. This means that when we look at violet in the garden, the retina or curtain at the back of our eye is affected 750 million millions times every second.

Dipak Sengupta
Third Year, Science

RECENT ADDITIONS TO THE COLLEGE LIBRARY

PHILOSOPHY & RELIGION

1. অনন্তকুমার ভট্টাচার্য ন্যায়তর্কতীর্থ—বৈভাষিক দর্শন।
2. Rasvihary Das—Handbook of Kant's Critique of Pure Reason.
3. G. E. Moore—Philosophical Studies.
4. Sitansusekhar Bagchi—Inductive Reasoning.
5. Adhar Chandra Das—Introduction to Logic : Vols. I & II.
6. Carveth Read—Logic : Parts I & II.
7. Gardner Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology.
8. S. Radhakrishnan—Principal Upanisads.
9. Kalyan Chandra Gupta—Monism.

SOCIOLOGY, ECONOMICS AND POLITICS

1. Nabagopal Das.—Studies in Indian Economic Problems.
2. Das & Chatterjee,—Introduction to Indian Economics.
3. Sibnath Chakrabarty—Introduction to Politics : 3rd ed.
4. Edward Hostings Chamberlin—Theory of Monopolistic Competition.
5. Chester Bowles—Ambassador's Report.
6. Reserve Bank of India—Report on Currency & Finance for the year 1953-54.
7. Govt. of India—India : A Reference Annual, 1954.
8. A. W. Stonier & D. C. Hague—Text-book of Economic Theory.
9. Hugh Tinker—Foundations of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma.
10. Maurice Dobb—Soviet Economic Development Since 1917.
11. E. F. M. Durbin—Politics of Democratic Socialism : An Essay on Social Policy.
12. N. Das—Men Without Work (Eastern Economist Pamphlet).
13. H. T. Parekh —Bombay Money Market.
14. অরুণকুমার সেন—পৌরবিজ্ঞান : পঞ্চম সংস্করণ।
15. William J. Baumal—Economic Dynamics : An Introduction.
16. B. R. Misra—Indian Federal Finance.

17. Omprakash Aggarwala—Fundamental Rights and Constitutional Remedies : Vols. I & II.
18. B. K. Madan—Economic Problems of Under-developed Countries in Asia.
19. Abba P. Lerner—Essays in Economic Analysis.
20. R. N. Bhargava—Public Finance : Its Theory and Practice in India.
21. Paul Anthony Samuelson—Foundations of Economic Analysis.
22. N. Srinivasan—Democratic Government in India.
23. B. Dasgupta—Provincial Taxation Under Autonomy.
24. Kenneth K. Kurihara—Monetary Theory and Public Policy.
25. Subimal Mukherjee International Law Redefined.
26. J. A. Schumpeter—History of Economic Analysis.

STATISTICS

1. Karl J. Holzinger & Harry H. Harman—Statistics of National Income and Expenditure.
2. Maurice G. Kendall—Advanced Theory of Statistics : Vols. I & II.
3. C. Radhakrishna Rao—Advanced Statistical Methods in Biometric Research.
4. R. L. Anderson & T. A. Bancroft—Statistical Theory in Research.
5. J. Tinbergen—Econometrics.
6. M. H. Quenouille—Design and Analysis of Experiment.
7. J. L. Doob—Stochastic Processes.
8. Cowles Commission Research Staff Members—Studies in Econometric Methods.
9. Abraham Wald—Sequential Analysis.
10. G. F. C. Searle—Experimental Elasticity.
11. W. P. Elderton—Frequency Curves and Correlation.
12. Herman Wold—Demand Analysis.
13. N. G. Kendall—Rank Correlation Methods.
14. —Excercises in Theoretical Statistics.

MATHEMATICS

1. J. M. Kar—Hydrostatics.
2. Harry Lass—Vector and Tensor Analysis.
3. H. R. Cooley—First Course in Calculus.
4. R. E. Langer—Ordinary Differential Equations.
5. W. F. Osgood—Functions of Real Variables.
6. E, H. Smart—Advanced Dynamics : Vol. I.

7. Horace Lamb—Elementary Course of Infinitesimal Calculus.
8. J. M. Hyslop—Infinite Series.
9. Hubertus Strughald—Green and Red Planet.
10. E. C. Titchmarsh—Theory of Functions.

PHYSICS

1. R. G. Mitton—Heat.
2. Sydney Chapman—Earth's Magnetism.
3. H. M. Browning & L. Starbuck—Practical Physics for Inter. B. Sc. Students.
4. R. G. Mitton—Electricity and Magnetism.
5. Manindra Chandra Guha—Elements of Nuclear Physics.
6. R. A. Millikan & H. G. Gale—New Elementary Physics.
7. L. W. Loeb—Fundamental of Electricity and Magnetism.
8. G. T. P. Tarrant—Physics : Vols. I & II.
9. H. W. Heckstall-smith—Intermediate Electrical Theory.

CHEMISTRY

1. Ian Heibbron and Others—Thorpe's Dictionary of Applied Chemistry : Volume XI

GEOLOGY

1. Alfred Sheerwood Romer—Vertebrate Palæontology.
2. Marland P. Billings—Structural Geology.
3. Charles Merrick Nevin—Principles of Structural Geology.
4. D. N. Wadia—Geology of India : 3rd ed.
5. W. W. Watts—Geology for Beginners : 6th ed.
6. Henry Woods—Palæontology—Invertebrate.
7. H. H. Read—Rutley's Elements of Mineralogy.
8. G. W. Tyrrell—Principles of Petrology.
9. A. Morley Davies—Introduction to Palæontology.
10. Aban M. Bateman—Economic Mineral Deposits.
11. Edward Salisbury Dana—Text-book of Mineralogy.
12. William H. Twenhofel & R. R. Shrock—Invertebrate Palæontology.
13. Hatch, Wells & Wells—Petrology of Igneous Rocks.
14. W. C. Krumbein & L. L. Sloss—Stratigraphy and Sedimentation.
15. A. Harker—Metamorphism.

BIOLOGY

1. Cooke, Burkitt & Barker—Biology : A Text-book for First Examination.
2. Kenoyer, Goddard & Miller—General Biology.
3. Lysenko—Agrobiology.

BOTANY

1. L. E. Hawker—Physiology of Fungi.
2. E. N. Transeau, Sampson & Triffany—Text-book of Botany
3. F. C. Bawden—Plant Viruses and Virus Diseases.
4. A. Guilliermond—Cytoplasm of the Plant Cell.

ZOOLOGY

1. William King Gregory—Evolution Emerging : Vols. I & II
2. Julian Huxley—Evolution in Action.
3. R. W. Goldschmidt—Understanding Heredity.
4. A. F. Huettner—Fundamentals of Comparative Embryology of the Vertebrates.
5. Walter & Scyles—Biology of Vertebrates.
6. Gresson—Essentials of General Cytology.

ENGLISH

1. George Meredith—Egoist.
2. —Ordeal of Richard Feveral.
3. W. C. Ward ; Ed.—William Wycherley.
4. F. W. Bateson—Wordsworth.
5. R. Gittings—John Keats.
6. R. P. Blackmur—Language as Gesture : Essays in Poetry.
7. Ernest Hemingway—First Forty-nine Stories.
8. —Across the River and Into the Trees.
9. —A Farewell to Arms.
10. Kenneth Hopkins—Poets Laureates.
11. Laurence Brander—George Orwell.
12. V. D. S. Pinto—Crisis in English Poetry, 1880-1940.
13. E. M. Forster—Aspects of the Novel.
14. F. R. Leavis—New Bearings in English Poetry.
15. George Orwell—Keep the Aspidistra Flying.
16. W. Somerset Maugham—Ten Novels and Their Authors.
17. Arthur Conan Doyle—Professor Challenger Stories.
18. E. Hardy—Thomas Hardy.
19. H. N. Weathered—Selected Essays of E. V. Lucas.
20. Ernest Barker—Age and Youth.
21. Samuel Richardson—Clarissa : Vols. I & II.
22. George Etherage—Dramatic Works : Vols. I & II.
23. Sir Harold Scott—Scotland Yard.
24. Otis & Needleman—History of English Literature.
25. Jane Austen—Emma.
26. —Persuasion.

Recent Additions to the College Library

GEOGRAPHY

1. Spate—India and Pakistan.
2. A. H. Jameson & M. T. M Ormsby—Mathematical Geography : Vol. II.
3. Unstead & Taylor—General and Regional Geography.
4. T. A. Blair—Weather Elements.
5. Robinson—Elements of Cartography.
6. Trewartha—Japan.
7. Horrocks—Physical Geography & Climatology.
8. Monkhouse—Principles of Physical Geography.

COMMERCIAL ARITHMETIC & GEOGRAPHY

1. Chisholm—Hand-book of Commercial Geography.
2. Anil Ranjan Majumder & Debendra Nath Mitra—Commercial Arithmetic.

HISTORY

1. Winston S. Churchill—Second World War : Vols. V & VI
2. C. D. Hazen—Europe since 1815.
3. Will Durant—Story of Civilisation : Vols. II & V.
4. Thompson & Johnson—Introduction to Medieval Europe : 300-1500.
5. A. M. Johnson—Europe in the 16th Century : 1494-1598.
6. Bury, Cook & Adcock—Cambridge Ancient History : Vol. V (Athens).
7. E. H. Carr.—International Relations Between the Two World Wars : 1919-1939.
8. Abu'L-Fazal Abbami—Ain-i Akbari : Vol. I.
9. G. M. Gathone-Hardy—Short History of International Affairs.
10. Barker & Others—European Inheritance : Vol. III.

SANSKRIT

1. Kshitish Chandra Chatterjee—Vedic Selection : Part I.
2. William Dwight Whitney—Sanskrit Grammar.
3. Magha—Sisupalavadham : Canto II. Edited by Saradaranjan Roy

GENERAL TOPICS

1. John Hunt—Ascent of Everest.
2. B. Croce—Aesthetic.
3. Bhupendra Nath Dutta—Swami Vivekananda.
4. S. R. Dongerkery—Universities in Britain.

বাংলা

১। বিপিন চন্দ্র পাল—মার্কিনে চারিমাস ও বিলাতের কথা ॥ প্রথম অংশ।
২। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচরিতা রায়—গল্পকার শরৎচন্দ্র।
৩। অমলেন্দু দাশগুপ্ত—ঋষি রবীন্দ্রনাথ।
৪। গোপাল হালদার—বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা ॥ প্রথম খণ্ড।
৫। আজহার উদ্দীন খান—বাংলা সাহিত্যে নজরুল।
৬। বুদ্ধদেব বসু—সাহিত্যচর্চা।
৭। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত—আধুনিক বাংলা কবিতা।
৮। প্রফুল্লচন্দ্র রায়—আত্মচরিত।
৯। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা।
১০। রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত : তৃতীয় সংস্করণ।
১১। প্রমথনাথ বিশী—বাংলা সাহিত্যের নরনারী।
১২। —রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প।
১৩। স্বামী গম্ভীরানন্দ—শ্রীমা সারদা দেবী।
১৪। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পদাবলী-পরিচয়।
১৫। বিমল মিত্র—সাহেব বিবি গোলাম : দ্বিতীয় সংস্করণ।
১৬। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—অর্কেস্ট্রা : দ্বিতীয় সংস্করণ।
১৭। —সংবর্ত।
১৮। ত্রিপুরাশঙ্কর সেন—উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য।
১৯। স্বামী অপূর্বানন্দ—কৈলাস ও মানসতীর্থ।
২০। ক্ষুদিরাম দাস—রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়।
২১। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব।
২২। জগদীশচন্দ্র ঘোষ—ভারত-আত্মার বাণী।
২৩। জীবেন্দ্র সিংহ রায়—প্রমথ চৌধুরী।
২৪। চিত্তরঞ্জন দেব—পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ।
২৫। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য।
২৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোক-সাহিত্য।
২৭। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত—সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা।
২৮। রাজনারায়ণ বসু—সেকাল আর একাল : পরিষৎ সংস্করণ।
২৯। গৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ—মুক্ত পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ।
৩০। ত্রিপুরারি চক্রবর্তী—মহাভারতে বিদুর ও গান্ধারী।
৩১। দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—বিজ্ঞান ভারতী ॥ বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান ॥ সংকলিত
৩২। নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি : দ্বিতীয় সংস্করণ
৩৩। গুরুপদ হালদার—বৈদ্যক-বৃত্তান্ত।
৩৪। হরপ্রসাদ মিত্র—সাহিত্য-পাঠকের ডায়ারি ॥ প্রথম পর্যায়।
৩৫। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ॥ তৃতীয় খণ্ড।

Inter-Collegiate Body Building and Weight Lifting Championship—1955

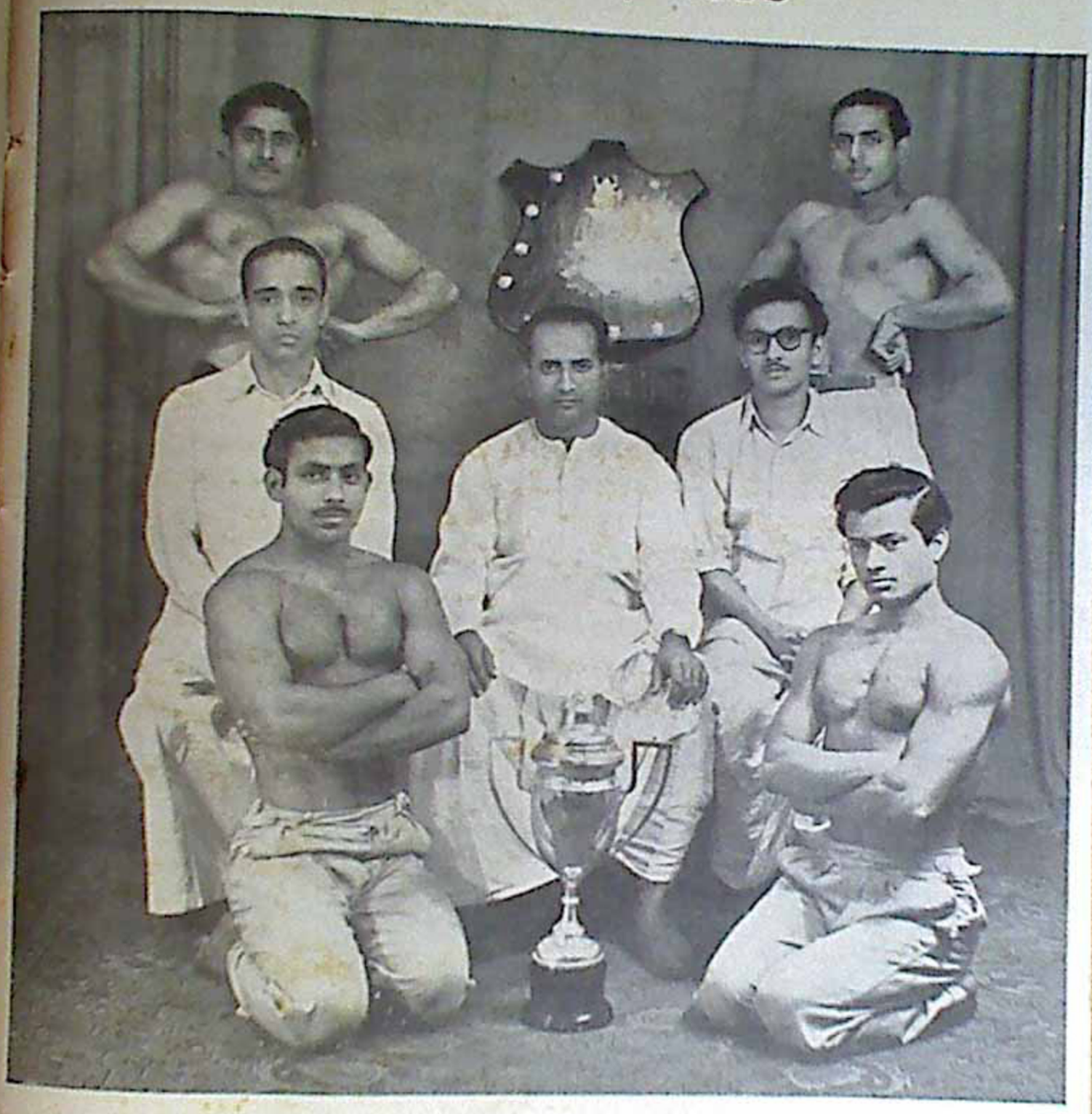

Standing from L. to R—Sujit Ghosh (*General Secy.*), Asim Bannerji.
Sitting on the Chair—L. to R—Sorashi Ganguly (*Physical Instructor*), Prof. Parimal Kar (*President, College Union*), Prithwish Basu (*Games Secy.*)
Sitting on the floor—L. to R—Bijan Bannerji, Amal Nag.

BEST PLATOON PRIZE WINNER (4th Platoon) ASUTOSH COLLEGE

2ND BENGAL BATTALION N. C. C :: BANKURA CAMP, 1954

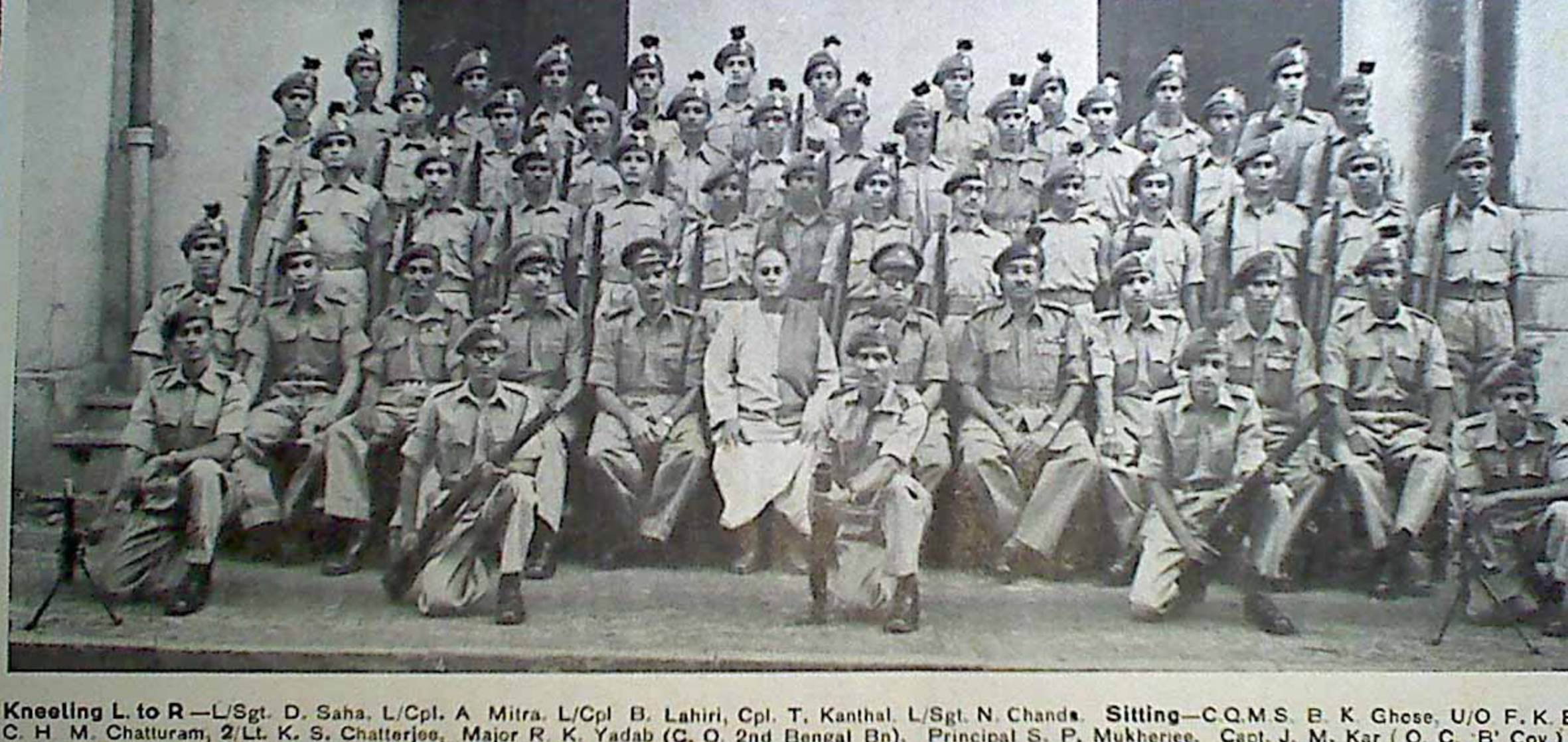

Kneeling L. to R—L/Sgt. D. Saha, L/Cpl. A. Mitra, L/Cpl. B. Lahiri, Cpl. T. Kanthal, L/Sgt. N. Chanda. **Sitting**—C.Q.M.S. B. K. Ghose, U/O F. K. E
C. H. M. Chatturam, 2/Lt. K. S. Chatterjee, Major R. K. Yadab (C. O. 2nd Bengal Bn), Principal S. P. Mukherjee, Capt. J. M. Kar (O. C. 'B' Coy)
Jagannath, R. S. M. B. Prasad. Nk. Sher Singh, R.Q.M.S.M. S. Banerjee. **Standing front**—L/Cpl. A. Mukherjee, L/Cpl. K. Banerjee. Cdt. K. Ach
Cdt. R. Mukherjee, L/Cpl. T. K. Das, L/Cpl. G. L. Chakravorty, L/Cpl. A. Roy, Cdt. A. K. Sen, Cdt. S. Aich, Cdt. S. Banerjee, L/Cpl. A. Chatte
L/Cpl. M. Mukherjee, Cdt. N. Ganguly. **Standing Middle**—Cdt. S. Chowdhuri, Cdt. P. Chakravorty, L/Cpl. J. Dutta, Cdt. S. Das, Cdt. B. Guha, Cdt. A.
L/Cpl. A. Chowdhury, Cdt. S. Sen. L/Cpl. R. N. Bose, Cdt. B. Sengupta, Cdt. P. Sengupta. Cdt. P. Tribedi. **Standing Rear rank**—Cdt. A. Nath,
M. Dasgupta, L/Cpl. P. Dasgupta, Cdt. P. Mukherjee, L/Cpl. A. Mukherjee, Cdt. N. Mondal, Cdt. B. Debnath, L/Cpl. D. Kar, Cdt. A. Dutta, Cdt. A. Gosw

आशुतोष कालेज पत्रिका

त्रिंश खंड * * १९५५

अभिवादन

हे जनगण के आराध्य देव,
तुझको मेरा शत-शत प्रणाम।

तू भारत-माता के सपूत,
तुम विश्व-शान्ति के अग्रदूत,
मानव स्वतन्त्रता अभिलाषी,
तुम जनगण के मथुरा-काशी।
हो पूर्ण तुम्हारा मनःकाम,
तुझको मेरा शत-शत प्रणाम।

भय-विकल जब हुए मानवगण,
रव त्राहि-त्राहि से भरा गगन,
भूतल पर हाहाकार मचा,
तू प्रेम-मंत्र ले आ पहुँचा,
झट काल-वज्र को लिया थाम,
तुझको मेरा शत-शत प्रणाम।

जनगण का भय-तम दूर हुआ,
आशा से मन भरपूर हुआ,
डूबी भव-तरणी पुनः जगी
झंझा को तुमने वाम किया
जग जपता नित तेरा सुनाम—
तुझको मेरा शत-शत प्रणाम।

गंगा-यमुना कल-कल स्वर में
गाती हैं तेरा शान्ति-गान
सर उठा हिमालय बोल रहा
हे वीर जवाहर तू महान।
हे भारत के गौरव निधान
तुझको मेरा शत-शत प्रणाम।

विष्णुदेव राय
तृतीय वर्ष। कला

अपना पराया

शाम का समय था। सूय पश्चिम के सन्निकट थे। उनकी रश्मियों से फूट पड़नेवाली अरुणिमा आकाश से धरती तक व्याप्त थी। रंग-विरंग के बादल एक मन मोहक दृश्य उपस्थित कर रहे थे। मदन अपने ज्येष्ठ भैया के साथ वर्षा-ऋतु की लुभावनी संध्या के सुन्दर दृश्य का आनन्द लूटने हरे-भरे धन खेतों की ओर जा रहा था। देखो वह बालक, जो पोखरे के टीले पर खड़ा है कितना सुन्दर लग रहा है।—भैयाने मदन से कहा। × × ×

मदन—"हां" सुन्दर तो लग रहा है—सुगठित शरीर, उन्नत ललाट, रेशम-से पतले सुन्दर-सुन्दर बाल, चांद-सा मुखड़ा वैसा ही सुन्दर, जैसे कमल के फूल। किसी उच्च कुल का ज्ञात होता है। किन्तु, तुम उसकी ओर इतना आकृष्ट क्यों हो भैया? पहचानते हो उसे? × × ×

भैया—पहचानता हूं और उस बेचारे का दुःख-दर्द भी अच्छी तरह जानता हूं। इतने भोले और सरल बालक को भी कोई क्यों सता सकता है—यही बात मेरी व्यथा का कारण बन रही है। सौतेली मां को हृदय नहीं होता क्या?

आखिर माजरा क्या है, पूरी बात बताओ भी तो"—मदनने उत्सुकता प्रकट करते हुए कहा।

भैया—इस बालक का नाम मोहन है। गांव के जमीन्दार श्रीहरिहर बाबू की पहली पत्नी से एकमात्र सन्तान। जब से नई बहूने भी पुत्र का जन्म दिया, तभी से मोहन के सिर पर आफत आई। विमाता को तो वह बेचारा फूटी आंखों भी नहीं सुहाता, हरिहर बाबू भी नई पत्नी के पर उसे झिड़कियां सुनाने में ही अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझा करते हैं। × × ×

महल से थोड़ी दूर पर एक पुराना खपड़ैल दालान है। उसमें एक छोटी-सी कोठरी है। उसमें टूटी हुई पुरानी चौकी है। यही कोठरी और चौकी मोहन को रहने और सोने को मिली है। स्कूल से आने के बाद उसका सारा समय इसी कोठरी में बीतता है। उसके माँ-बाप अपनी शिकायत के डर से उसे किसी के द्वार बैठने तक नहीं देते। उसकी विमाता उसे कष्ट देनेके लिए स्वयं कष्ट सह कर भोजन बनाती है। रूखी-सूखी रोटी, गील-कांच भात। तरकारी नदारद। कभी-कभी अधिक नमक तो कभी एकदम कम। कभी ऊबकर यदि वह खाने में आनाकानी करता है तो गालियाँ, डाँट-डपट और थप्पड़। × × ×

अनन्त व्रतका दिन था। "मोहन, क्या तुम-भी अनन्त करोगे"?—विमाताने पूछा। उसने उत्तर दिया हाँ। उसको प्रसन्नता हुई कि माँ आज मुझे अच्छा-अच्छा भोजन करावेगी। परन्तु बेचारे की आशा पर ओस पड़ गई। उस रात को सीधे उपवास रहना पड़ा। रात भर रोता रहा। चुप कौन करावे। व्रत के व्याज से ही भोला खीर-पूरी खा-खा कर मौजें उठा रहा था और उधर मोहन के पेट में चूहे कूद रहे थे। दूसरे दिन सुबह विमाता रात का वासी भात लेकर खिलाने आई। तुम्हीं सोच सकते हो कि मोहन पर क्या बीती होगी?

जाड़े के दिन में भोला के लिए ऊनी कपड़े बनते हैं, मोहन को एक कुर्त्ता और फटी धोती मिली है। ओढ़ने के लिए कई साल की ओढ़ी हुई फटी गुदड़ी दी गई है। मोहन शर्म के मारे स्कूल नहीं जाता। डरता है कहीं फटे वस्त्र देख कर लोग भीतरी रहस्य न ताड़ जायँ। परन्तु हरिहर बाबू तो लोगों से यही कहा फिरते हैं कि स्कूल जाने का नाम सुनते ही उसके सिर पर पहाड़ टूट पड़ता है। शाम को सिर मारता हूं पर सुबह को कन्नी काट ही जाता है। भोजन करने के बाद दिन भर "शैतान" गूलर का फूल बना रहता है। × × ×

भया, मैं तो ऐसी माँ की कल्पना भी नहीं कर सकता। माँ और निर्दयता—इन दोनों को मैं एक साथ सोच ही नहीं सकता। होगी वह

कोई चुड़ैल," भला, अपने लड़के को कोई इस तरह सता सकता है—मदन ने भैया के चुप होते ही कहा।

"चुड़ैल" भी उतनी कठोर नहीं हो सकती। और मदन, माँ और निर्दयता की कल्पना—तुम एक साथ कर पाओ या नहीं,—किन्तु यह जान लो कि नारी के हृदय में अपनों के लिए जितना प्रेम, प्यार और ममत्व है, अपनों के स्वार्थ को धक्का पहुँचानेवालों के प्रति उससे भी अधिक तीव्र घृणा और तिरस्कार। जानते हो, मोहन की उपस्थिति से भोला के स्वार्थ को धक्का पहुँचेगा—"विमाता के जी में यही खटका घर कर गई है"। × × ×

भैया कुछ और कहना चाहते थे कि मदन बोल उठा, "जाने दो भैया" चलो, लौटो घर की ओर। आज टहलने का सारा मजा फिर फिर हो गया। भैया, सच कहते हो, यह सोचने की बात है कि "इनशान" अपनी इनशानियत को क्यों भूल जाता है; अपना पराया क्यों हो जाता है; अपनों के भी साथ कुत्तों जैसा व्यवहार क्यों किया जाता है; अपनों के साथ घृणा और तिरस्कार की प्रचण्ड ज्वाला क्यों सुलगती रहती है"।

गिरिधारी तिवारी
तृतीय वर्ष। कला

हिन्दी में छायावाद

नव युग में जो वादों की बाढ़ सी चली, उसमें मुख्य-धारा 'छायावाद' की ही रही। 'छायावाद' चूँकि कुछ विचित्रता लिए आया, कहने का ढंग इसका अपना था, एक अनूठापन भरा था अतः इसे देख 'रामचन्द्र शुक्ल' जैसे हिन्दी साहित्य के अधिपति ने भी कह सुनाया कि 'छायावाद' केवल कहने का एक विचित्र ढंग हैं। पर बात ऐसी थी नहीं। छायावाद के एकाएक प्रस्फुटन के पीछे सामाजिक एवं राजनीतिक कारण थे जिनके धक्के खाकर यह अवचेतन मन से उतर कर चेतन में आ पहुँचा और कविता में प्रगट हो एक वाद बन चला।

द्विवेदी-युग में जब कि इतिवृत्तात्मकता इतनी बढ़ गई थी 'नारी' शब्द पर कुछ लिखना तो बैठा रहे नाम लेना भी पाप समझा जाने लगा; कवि बेचारे क्या करें विवश थे, उनकी नारी-सुलभ भावनाएँ कुण्ठित हो गईं और अवचेतन में जा दबीं। दूसरी ओर पराधीनतापाश में जकड़े रहने के कारण कवि कुछ स्वतंत्र न थे, वे कहते थे, लिखते थे तथा गाते भी थे पर एक आतंक सदा छाया रहता था वह था हमारा पर-वश होना। पर अवचेतन में सोई हुई कुण्ठित भावनाएँ कबतक सोई रहतीं, उन्हें बाहर आना था अतः बाहर आने के लिए उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया और अपने को एक विचित्र ढंग में सुशोभित किया। अतः छायावाद का जन्म कुछ नहीं बस केवल 'कुण्ठाओं का प्रस्फुटन, उनका परिणाम है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। साधारण व्यक्ति जब कि अपनी दबी इच्छाएँ स्वप्न-हास्य के माध्यम द्वारा प्रगट करते हैं तो कवि लोग उन्हें कविता के माध्यम में ला देते हैं।

छायावाद की मुख्य विशेषताएँ तीन हैं। प्रथम यह कि इसमें व्यक्तिवाद प्रधान है। कवि को 'अपना' प्यारा है उसे अपने से राग है वह उससे दूर नहीं जाता। यही कारण है कि ठीक यही 'व्यक्तिवाद'

'प्रसाद' में 'आनन्द-रति' 'पन्त' में 'आत्मरति' 'निराला' में 'ब्रह्म-रति' और 'देवीजी' में 'परोक्ष-रति' के रुप में प्रगट हुआ है। एक बात इन सारे छायावादियोंके साथ है और वह है 'प्रकृति-प्रेम'। 'पन्त' ने तो प्रकृतिको 'देवि मां, सहचरि प्राण तक कह डाला है। दूसरी विशेषता जो छायावाद की है वह है 'प्रकृत का माननीय करण'। छायावादी कवि प्राकृतिक वस्तुओं में चेतनताका आरोप करता है। उसने अपनी कुण्ठित भावनाओं के लिए प्रकृति का द्वार-मार्ग चुना। पन्त ने इसी कारण पेड़की पड़ी छाया से खूब बातें कीं हैं, कुछ अपनी सुनायी है। छाया को देख उन्हें 'दमयन्ती' की याद आ जाती है और किसी 'नलरुपी निष्ठुर से त्यक्ता' होने की भविष्यवाणी भी कर बैठते हैं।

तीसरी विशेषता जो छायावाद की है वह है इसका 'अभिव्यंजन-वैचित्र्य'। छायावादी कवि जो कुछ कहता है तथा लिखता, गाता है, एक अपनापन निरालापन लिए कहता है। यह कहने का नूतन ढंग योरपीय साहित्य के 'इक्सप्रेसनीज़्म' से बहुत कुछ प्रभावित जान पड़ता है जिसका मुख्य उद्देश्य 'कला कला के लिए है' है। 'महादेवी जी' इसी में फंसकर अपने "गीले पलकों" को छूने से मना करतीं हैं और "बिखरी पंखुड़ियां देखो" ऐसी आज्ञा देतीं हैं। यद्यपि निकली तो 'देवीजी' हैं छायावादी बन कर पर "पीड़ा में तुझको ढूंढ़ा तुझमें ढूढूँगी पीड़ा" ऐसी रहस्यवाद की कुछ उलटवाणियां जपते जपते इस समय पूरी की पूरी रहस्यवादी बच गईं हैं। निराला भी कुछ ऐसे ही "तुम प्रेम और मैं शान्ति" बनने को तैयार दिखाई देते हैं।

छायावाद के पिता प्रवर्तक 'प्रसाद' जो कुछ भी थे, जितने थे पूरे के पूरे 'छायावादी' थे। उन्हें सोलह आने छायावादी ही पुकारा जाय तो कुछ अतिश्योक्ति न होगी। उनका साहित्य 'प्रेम-साहित्य' है। छायावाद में प्रेम की बाज़ार है। कवि ने चारो ओर दरवाजा बन्द देख, प्रकृति के सर्वदा खुले दरवाजे से प्रवेश किया और उसमें चेतनता का आरोप कर, नारी का 'अशरीरी सौन्दर्य' एवं अतिन्द्रीय प्रेम' जगाकर छायावाद को

निखरा दिया। 'प्रसाद' इस बाज़ार में इतने पहुँचे हुए कवि थे कि "आँसू" नामक अपने 'विरह-काव्य' में "रो रोकर सिसक सिसक कर" भी अपनी 'करुण कहानी' कहते हुए अन्त में स्वयं पता नहीं पाते हैं कि 'वह' 'कौन था, या कौन थी'। उन्हें उनका प्रिय अनजान जान पड़ता है वे उसे दोनों मानते हैं।

"सुख अपमानित करता सा जब व्यंग्य हँसी हँसता है" तो प्रसाद चुपके से एकान्त रुदन करते हुए पूछ पड़ते हैं कि "यह कैसी परवसता है"। कुछ सज्जन इस छायावाद में छिपे प्रेम को मानव-तन की भूख मानते हैं पर बात ऐसी नहीं है। छायावादियों का दृष्टिकोण उसकी ओर 'उपभोग' का नहीं वरन एक 'आश्चर्य' का है। वह कुछ नहीं जानता, केवल 'हक्का वक्का सा' उसे निहारता है। सोलह आने छायावादी अपने प्रतिपालक 'प्रसाद' के अन्त होने पर छायावाद ने भी अब जाने का ही ठान लिया है। वह "प्रगतिवाद" के चढ़ाव के साथ उतार पर है। क्यों कि देवी जी भी अब कुछ अपना ही अलापती हैं। "तोड़ दो इस क्षितिजको मैं देख लूँ उस पार क्या है" इसकी उन्हें धुन है। 'पन्त' ने भी अब कुछ कदम तेजकिया है। मानव को 'अति दुख एवं अति सुख' से पीड़ित देख मानव जग में बंट जावे सुख-दुख से औ दुख से" ऐसी कामना दिखाई है। इधर 'प्रगतिवादी' कविता झोपड़ी झोपड़ी छान रही है। प्रगतिवादी कवि 'उस उपर वाले एक को भी कोसते हैं' जो 'यह' सब देख रहा है। प्रगतिवाद के पक्के पुजारी 'अंचल नी' भी "वह मजूर की अन्धी लड़की" कह कह के तरस दिखाते हैं। अब छापावाद के उतार पर प्रगतिवाद का चढ़ाव एवं उसकी सन्ध्या पर इसको प्रातः झाँक रहा है।

राम अधार मल्ल (सम्पादक)

तृतीय वर्ष। कला

पुकार

कौन कौन तुम खड़ी कौन हो,
म्लान किए मुख रोती सी ;
प्रथम प्रहर में जीवन के इस,
हँसता यौवन धोती सी।

अभी अभी जन्मी हो कल की
आकस्मिक रोने की धुन,
कहो प्रिय ! है दिया किसी ने ;
या है लिया कहीं से चुन।

आशा से हो क्या विहीन अब,
वह वसंत ना आयेगा ;
रूखा सूखा यह जीवन-वन
नहीं हरा हो पायगा।

पूछ रहे हो क्या चुनने की,
गढ़ी गढ़ाई हूँ जग की ;
उँचे ले हँसता वसंत जग,
मारी हूँ मैं पतझड़ की।

सदियाँ बीती आस लगाय,
उस वसंत के आने की ;
ज्वाला भरे तड़पते जग को
फिर से हरा बनाने की।

हूँ कविता मैं निकल पड़ी अब,
लिये आह मानव मुख से
पहले थी कुंठित कंठों में,
देखी अन्त न जग दुख से।

सोच रही हूं म्लान किये मुख,
खड़ी खड़ी मर्दन की बात;
करुँ रुदन रण-चंडी सी मैं,
आयेगा तव विमल प्रभात।

या यह भी हूं सोच रही,
मन हीं मन जगत समझ लेगा;
अपने अन्दर की हरीतिमा,
जगती में वितरा देगा।

शंकर का हो आवाहन,
तव निकले प्रलय रुप डमरु;
याकि प्रेम भरी वंशीवाले की
मचल पड़े घुघुरू।

बता दो हमें री कविते,
वे शास्त्र तुम्हारे हैं कितने;
हो जिनके बल कूद रही तुम,
उपा लाने को वन में।

युग बीते, हूं देख रहा मैं,
इन नयनों में तेरे जल;
रूको, रुको क्षण भर तो सुन लो,
नीरवता में रोई कल।

पुकार

हार गयी रोते-रोते अब रुदन नहीं
बस प्रलय मचे ;
आय गांधी समझौते से
पाय बस कुछ चल निकले।

सदियो से मेरी तड़पन का
क्या इस जग को ज्ञान नहीं,
कोइ कह दे सत्य-सत्य,
क्या यह जग धूर्त महान नहीं ?

हरजीत सिंह
प्रथम वर्ष। विज्ञान

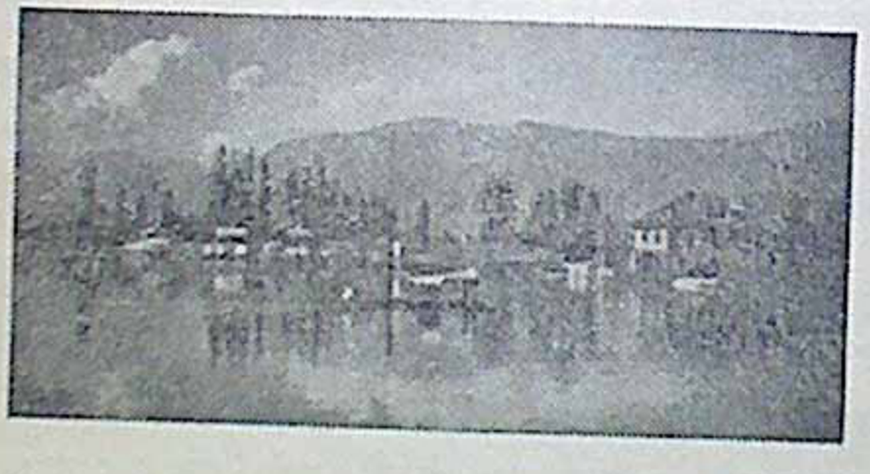

संत-साहित्य में तुलसी

संत साहित्य के प्रादुर्भाव की घड़ी अत्यन्त ही भयावह थी। यह वह समय था जबकि भारत में मुसलमानों के पाँव जम जाने से हिन्दू जनता के हृदय में उमंग, साहस और अभिमान के लिए स्थान न रह गया था। हिन्दू-जाति के अन्तर्गत फूट के बीज पड़ गये थे। पर यही समय हिन्दी साहित्य का शैशवकाल था। उनके समक्ष ही उनके पूज्य पुरुषों का अनादर होता था, देव-मन्दिर गिराये जाते थे और वे अपने आह भरे जीवन में पामर की तरह अफसोस की उसांस लेते थे। वे कर ही क्या सकते थे ? वे तो पराधीनता की सुदृढ़ सांकलों बँधकर आशक्त एवं विधुर-विधूरा अबला की तरह जीवन बिता रहे थे। ऐसी हालत में शक्ति-विहीन मानवजाति के लिए परम कारूणिक परमेश्वर की करुणा और अमिट बल की अराधना के सिवा आत्म-शान्ति का दूसरा चारा ही क्या हो सकता था। इस काल के प्रतिनिधि अपने साहस और उत्साह से हताश जनता के हृदय को संभालने और स्थिर रखने के लिए ईश्वर-भक्ति की नयी राह ढूंढने लगे। भक्तिकाल का यही सारा साहित्य संत साहित्य माना जाता है।

इस साहित्य में मुसलमान भक्त कवियों ने भी पूरा भाग लिया।

संत साहित्य-सरीता की दो धारायें फूट निकलीं-सगुण और निर्गुण। इन धाराओं के संत कवियों के काव्य निर्झर को पाकर शारदा-सदन की देहली सरसा उठी। सगुण धारा दो ओर बही—एक राम काव्य की ओर दूसरी कृष्ण काव्य की ओर। सगुण धारा के कवि शबरी-गणिका गृद्ध अजामिल आदि की सुगति के गीत गाते तथा अनेक देवताओं के रूप में ईश्वर की उपासना करते थे। इस धारा की रचनायें शुद्ध साहित्यिक मानी जाती हैं। निर्गुण धारा से भी दो शाखाय फूट पड़ी। एक ज्ञानाश्रयी दूसरी प्रेमाश्रयी। निर्गुण कवियों ने राम रहीम की एकता समझाने के

उपर काफी जोर दिया। इस धारा की पहली शाखा की रचनायें समीचीन प्रस्फुटित न हो पायी। भद्दी तुकबंदियों एवं भरती के शब्दों की भरमार सी हो गई। हाँ इसकी दूसरी शाखा प्रेम-मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी रचनायें ठोस साहित्यिक समझी जाती है। इनकी प्रेम गाथायें हिन्दू हृदय के मर्म को स्पर्श करनेवाली हैं। प्रेम की पीर को लेकर उसकी व्यंजना करना ही इन कवियों की विशेषता है। इस शाखा के प्रसिद्ध कवि 'जायसी' हुए। इनका 'पद्मावत' सचमुच ही हिन्दी साहित्य का एक अनुठा मणि है।

किन्तु कवि समय का प्रतिनिधि होता है। उसके काव्य में तत्कालीन परिस्थिति का चित्र हुआ करता है। इस विचार से तुलसीदास सबसे लोक प्रिय कवि हैं। तुलसी ने अपने काव्य-प्रसून शारदा को समर्पितकर हिन्दी साहित्य का परिवर्द्धन किया। कबीर, सूर आदि कवियों ने हिन्दी साहित्य को फूला फला बनाने की भरपूर चेष्टा की। लेकिन जीवन की विभिन्न दशाओं का समुचित प्रदर्शन न हो सका। यह काम तुलसी ने पूरा किया।

कविता जीवन की व्याख्या होती है और तुलसी ने जीवन की सारी दशाओं का समयक वर्णन किया। इनकी काव्य में युग की झंकार है, और है जनता की पूकार। इनकी कृतियों में औरों की अपेक्षा अतिशय प्रभावित करती है। 'सत्यं, शिवं, सुन्दरं, ये तीनों गुण इनके काव्य में मौजूद है। व्रज भाषा और अवधी दोनों पर इनका समान अधिकार है। व्यक्तिगत साधना के साथ लोक धर्म की अनुठी व्यंजना ने इनके काव्य में चार चाँद लगा दिये है। इनके काव्य में रचना-नेपुण्य का भद्दा प्रदर्शन तो कहीं दृष्टिगोचर होता ही नहीं।

उपदेश और शिक्षायें भी यत्र तत्र मिलती है। प्रकृति का भी सुन्दर वर्णन हुआ है। दूसरे कवि जीवन के विशेष अंग को लेकर चलते हैं, तो तुलसी ने समस्त जी सागोंपांग व्याख्या की है। मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए इन्होंने शैव और वैष्णव में ऐक्य कराने का श्लाघनीय प्रयत्न

किया है। इनके अलंकारों एवं रसों का सुन्दर समावेश देखकर 'मिश्रबन्धु' इन्हे संसार के सबसे उत्तम कवि मानते हैं।

हिन्दी काव्य का चमत्कार पहले पहल इनकी ही रचनाओं में दीख पड़ा। इनकी भाषा भावों के अनुरुप शुद्ध साहित्यिक भाषा है, इतनी सरस और प्रांजल हैं कि बारह खड़ी से लेकर अगाध साहित्य-मनीषी तक आनन्द प्राप्त करते है। यही कारण है कि इनकी भाषा का प्रयोग आगे चलकर बराबर कविता में होता रहा। हिन्दी-काव्य की भिन्न भिन्न प्रकार की रचना शैली के उपर इनका काफी अधिकार देखा जाता है। हां कहीं कहीं अरबी-फारसी तथा पूर्वी तथा बुन्देल खंडी शब्दों का प्रयोग है। इनके कई ग्रन्थ हिन्दी-काव्य के नमूने समझे जाते हैं।

रामायण तो सचमुच ही हिन्दी साहित्य में अभूतपूर्व रचना है। इस महाकाव्य का हिन्दी साहित्य में बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण मुख्यतः इनकी सीधी साधी लोक-भाषा सरल एवं बोधगम्य भाव तथा रोचक रचना-शैली है। इन्होने अपनी रचना शैली को अलंकारों के द्वारा भारी भरकम बनाने का कहीं भी व्यर्थ प्रयास नही किया है। आज इनका रामायण सारी हिन्दू जनता की कण्ठहार सा हो गया है। रामायण का उपदेश हृदय में अमृत रस घोल देता है। तुलसी-काव्य सौष्ठव से मुग्ध होकर किसी ने लिखा है।

"कविता करके तुलसी विकसे।
कविता लसी या तुलसी की कला"।

यह कैसा सुन्दर उपदेश है, देखिये :—

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवसि नरक अधिकारी"॥

और भी :—

"मुखिया मुख सो चाहियें, खान पान कह एक।
पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक"॥

इनकी भाषा तथा अलंकारों की योजना अत्यन्त रमणीय है।

"प्रभु चितवन पुनि चितै मही,
राजत लोचन लोल।
खेलत मनसिज मीन युग,
जनु विधि मंडोल डोल" ॥

कथा काव्य में मार्मिक स्थानों की पूरी पहचान महाकवियों की विशेषता समझी जाती है। कहीं कहीं तो इनके संवेदनशील हृदय के प्रत्यक्ष भावाभिव्यंजना से अन्तःकरण करुणा से परिप्लावित हो जाता है। अतीत का भावपूर्ण चित्रमूर्त्तरूप धारणकर बरबस नाचने लगता है और हृदय रस-सिक्त हो थिरक उठता है।

बन्य तथा बीहड़ पहाड़ी राहों से गुचरते हुए सीता, लक्ष्मण के साथ प्रेम-मूर्ति राम को निरख कर बन के नर-नारियों के मन में बड़ा ही विषाद मालूम होता है। वे कहते है।

"राम लषण सब अंग तुम्हारे,
देखि सोच अति हृदय हमारे।
मारग चलेहु पयादेहि पाये,
ज्योतिष झूठ हमारे हि भायें॥
सुनि सुविषाद सकल पछिता ही,
रानी राय किन्ह भल नाही॥
ते पितु-मातु कहहु सखि कैसे,
जिन्ह पठये बन बालक ऐसे" ॥

उपर्युक्त पद्य में करुणा कलित कवि के हृदय की भावुकता के स्पष्ट दर्शन होते हैं।

तुलसी ने समाज को अपने काव्य-पुञ्ज से अलग न रखा। यही कारण है कि तत्कालीन समाज पर उनका अक्षुराण अधिकार देखा जाता है।

काव्य-साहित्य के समयक् निर्वाह के माने में उनका काम अति श्लाघनीय रहा है। काव्य-साहित्य के वास्तविक प्रयोजन के अनुसार यह कहना असंगत न होगा कि गोस्वामी तुलसीदास खरी खान से निखालिस सोने बावन तोले पाव रती सही उतरे हैं।

मौजीलाल सिंह
तृतीय वर्ष। कला

ASUTOSH COLLEGE MAGAZINE

LIST OF EDITORS—1924-1955

1924	Prof. Mohini Mohon Mukherjee, M.A.
1925	Basudev Banerjee.
1926	Bibhas Roy Choudhury and S. Raghavachari.
1927	Subodh Biswas, Dhiren Lahiri and Satiranjan Banerjee.
1928	Sasi Bhusan Barik and Kalyan Kumar Sen Gupta.
1929	Asoke Kumar Banerjee and Shymapada Mukherjee.
1930	Prabhat Kumer Bose and Kausik Kumar Mitra.
1931	Shyamapada Mukherjee and Prafulla Kumar Sarkar.
1932	Amiya Ratan Mukherjee, Bireswar Chatterjee and Batto Krishto Banerjee.
1933	Hari Prasanna Chakravarty and Prabhat Sen.
1934	Govinda Roy and Anil Kumar Chakravarty.
1935	Binoy Ghose and Basanta Ghosal.
1936	Devaprasad Bhattacharya, Santosh Mitra and Miss Phulrani Ghose.
1937	Devaprasad Chatterjee, Narahari Kaviraj and Miss Bani Roy.
1938	Santosh Bose and Miss Pratima Banerjee.
1939	Subrata Sarkar and Miss Nirupama Banerjee.
1940	Ramkrishna Maitra and Miss Alaka Guha.
1941	Sanat Ghosal and Miss Lila Maitra.
1942	Subhendu Banerjee and Miss Kshama Banerjee.
1943	Samir Basu and Miss Purabi Banerjee.
1944	No publication due to 'Paper Economy'
1945	Asim Bhattacharya, Amiya Mukherjee, Jibendra Sinha Roy, Ranendranath Bose, Miss Kamala Dutt and Miss Indira Bose.
1946	Editor-in-chief : Pijuskanti Chatterjee. Arun Kumar Dasgupta, Naresh Chandra Ghose, Suhas Kumar Roy, Ramaprasad Chakravarty, Amal Kumar Chakravarty, Miss Samjukta Kar and Miss Srimanti Chakravarty.

1947	Editor-in-chief : Sobhanlal Mukherjee. Arun Mukherjee, Asoke Sen Gupta, Asoke Chatterjee, Ranjit Ganguly, Sukumar Banerjee and Miss Pushpanjali Sen.
1948	Editor-in-chief : Tejen Guha Roy. Miss Nilima Bose, Miss Bithi Sen, Sunil Das Gupta, Pratul Bardhan Roy, Prithvish Roy Choudhury, Pranakrishna Bhattacharya and Bireshwar Banerjee.
1949	Satyen Mukherjee and Miss Jayasree Choudhury.
1950	Madhusudan Ghose.
1951	Arun Kumar Roy.
1952	Smritibikash Ghose.
1953	Dulal Das.
1954	Gopal Chandra Banerjee.
1955	Samarendra Sen Gupta.